সিপাহী যুদ্ধ

শ্রী দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়, বি-এ

বরদা এজেন্সী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

314
1.11.32

১৷৷০

সূচি

	বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	লর্ড ডাল্‌হৌসির শাসন-মহিমা	...	৯
২।	বিদ্রোহের নিদর্শন	...	২৮
৩।	বিদ্রোহের অগ্নিশিখা—মিরাট ও দিল্লী		৩৬
৪।	বিদ্রোহের বিস্তার	...	৪৬
৫।	এলাহাবাদ	...	৫৮
৬।	কানপুরে নানা সাহেব	...	৬৫
৭।	পঞ্চনদে	...	৮৪
৮।	দিল্লী-উদ্ধার	...	৯৩
৯।	শিয়ালকোট ও মিয়াঁমিরের সিপাহী		১০০
১০।	বাংলাদেশে	...	১০৪
১১।	বিহারে—কুমার সিংহ	...	১০৮
১২।	রোহিলখণ্ড, ফতেগড় ইত্যাদি স্থানে		১১৮
১৩।	আগ্রায়	...	১২৭
১৪।	অযোধ্যা—লক্ষ্ণৌয়ে	...	১৩০
১৫।	বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ-দমন	...	১৪০
১৬।	তাঁতিয়া তোপি	...	১৪৫
১৭।	ফতেগড়ে শান্তি স্থাপন	...	১৪৮

স্থচি

১৮।	লক্ষ্ণৌ ও বেরিলি উদ্ধার	...	১৫০
১৯।	ঝাঁসি—লক্ষ্মী বাই	...	১৫৪
২০।	তাঁতিয়া তোপির পরিণাম	...	১৬৭
২১।	বিদ্রোহের যবনিকা	...	১৭১

সিপাহী যুদ্ধ

সিপাহী যুদ্ধ

শ্রী দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়, বি-এ

বরদা এজেন্সী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

314
1.11.32

১৷৷০

প্রকাশক
শ্রী শিশিরকুমার নিয়োগী, এম-এ, বি-এল,
বরদা এজেন্সী,
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

আশ্বিন, ১৩৩৮

৭৭ নং হরিঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মানসী প্রেস হইতে
শ্রীঅম্বিকাচরণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নিবেদন

বৃটিশ ভারতের ইতিহাসে সিপাহী বিদ্রোহ সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই বিদ্রোহ শক্তিশালী ইংরাজ জাতির অন্তরে নিদারুণ বিভীষিকার সঞ্চার করিয়াছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে ইংরাজ প্রভাব কিছু দিনের জন্য লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, সিপাহী বিদ্রোহের রোমাঞ্চকর কাহিনী লইয়াই "সিপাহী যুদ্ধ" রচিত।

৺ রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের বিরাট পাঁচখণ্ডে সমাপ্ত "সিপাহি-যুদ্ধের ইতিহাস", T. R. E. Holmes প্রণীত History of the Indian Mutiny, Sir John Kaye প্রণীত History of the Sepoy War এবং Col. G. B Malleson প্রণীত History of the Indian Mutiny of 1857 প্রভৃতি বিশেষ প্রামাণ্য গ্রন্থের উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়াছি। "সিপাহি-যুদ্ধের ইতিহাস" হইতে কয়েকটি স্থানে অংশ বিশেষ উদ্ধৃতও করা হইয়াছে। ইতি—

চুঁচুড়া
৩রা ভাদ্র, ১৩৩৮ সাল।

নিবেদক

লেখকের অন্যান্য বই

চাণক্য

আজব ঘুম

ভুলের ফল

বোকার কাণ্ড

রূপ-সনাতন

ঋষি টলষ্টয়

এ যুগের দাসত্ব

টলষ্টয়ের গল্প

সেকন্দরের কথা

শিবাজী মহারাজ

মহারাজ নন্দকুমার

সূচি

	বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	লর্ড ডাল্‌হৌসির শাসন-মহিমা	...	৯
২।	বিদ্রোহের নিদর্শন	...	২৮
৩।	বিদ্রোহের অগ্নিশিখা—মিরাট ও দিল্লী		৩৬
৪।	বিদ্রোহের বিস্তার	...	৪৬
৫।	এলাহাবাদ	...	৫৮
৬।	কানপুরে নানা সাহেব	...	৬৫
৭।	পঞ্চনদে	...	৮৪
৮।	দিল্লী-উদ্ধার	...	৯৩
৯।	শিয়ালকোট ও মিয়াঁমিরের সিপাহী		১০০
১০।	বাংলাদেশে	...	১০৪
১১।	বিহারে—কুমার সিংহ	...	১০৮
১২।	রোহিলখণ্ড, ফতেগড় ইত্যাদি স্থানে		১১৮
১৩।	আগ্রায়	...	১২৭
১৪।	অযোধ্যা—লক্ষ্ণৌয়ে	...	১৩০
১৫।	বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ-দমন	...	১৪০
১৬।	তাঁতিয়া তোপি	...	১৪৫
১৭।	ফতেগড়ে শান্তি স্থাপন	...	১৪৮

স্থচি

১৮।	লক্ষ্ণৌ ও বেরিলি উদ্ধার	...	১৫০
১৯।	ঝাঁসি—লক্ষ্মী বাই	...	১৫৪
২০।	তাঁতিয়া তোপির পরিণাম	...	১৬৭
২১।	বিদ্রোহের যবনিকা	...	১৭১

সিপাহী যুদ্ধ

১

লর্ড ডাল্‌হৌসির শাসন-মহিমা

বীর-জননী পঞ্চনদভূমি ডাল্‌হৌসির অদ্ভুত শাসন-মহিমায় বৃটিশের পদানত, পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহের অদম্য-তেজোমণ্ডিত বৃটিশ-বিরোধী খাল্‌সা শিখ নিরস্ত্র, এবং অযোধ্যা প্রভৃতি স্বাধীনরাজ্য সদ্য দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছে।

রণজিৎ সিংহের পুত্র দলীপ সিংহ নিতান্ত নাবালক ছিলেন, কাজেই দলীপের মাতা মহারাণী ঝিন্দন পাঞ্জাব-রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু লর্ড হার্ডিং ব্যবস্থা করিলেন যে, বৃটিশ সরকারের একজন রেসিডেণ্ট পাঞ্জাবের শাসন-কার্য্য চালাইবেন। স্যর হেন্‌রি লরেন্স এই রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন। মহারাণী ঝিন্দন অত্যন্ত তেজস্বিনী ছিলেন, কোন অপমানই তিনি সহজে হজম করিতে পারিতেন না; এই জন্য রাজপুরুষগণ বিনাবিচারে এই মহীয়সী মহিলাকে পাঞ্জাবের শেখপুর নামক স্থানে

নির্ব্বাসিত করিলেন। স্বাধীন রাজ্যের রাণী কারাবাসিনী হইলেন। বালক মহারাজ দলীপ বৃটিশ রেসিডেণ্টের হাতের পুতুলমাত্র ছিলেন, সুতরাং এই বালকের নামে রেসিডেণ্ট-সাহেব ঝিন্দনের শেখপুর হইতেও চির-নির্ব্বাসন দণ্ডের আদেশ বাহির করিলেন।

পুত্রের নামাঙ্কিত দণ্ডাদেশ-পত্র পাইয়াও বীরাঙ্গনা বিস্মিত হইলেন না, আর দলীপও বুঝিতে পারিলেন না কার চক্রান্তে তাঁ'রই জননী পাঞ্জাব হইতে নিষ্কাসিত হইলেন। শেখপুর হইতে মহারাণীকে কাশীতে আনিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। শুধু ইহাই নয়, পরবর্ত্তী রেসিডেণ্ট স্যর ফ্রেডারিক কারি মহারাণীর দেড় লক্ষ টাকার বৃত্তি কমাইয়া মাত্র বারো হাজার টাকা করিলেন এবং তাঁর মূল্যবান অলঙ্কারগুলিও বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলেন।

সমস্ত পঞ্চনদে অসন্তোষ দেখা দিল। মুলতান রাজ্যের দেওয়ান মূলরাজ লাহোর দরবারে নিজের অবস্থা জানাইয়া পদত্যাগ করিলেন এবং পরবর্ত্তী দেওয়ানের উপর দুর্গের ভার অর্পণ করিলেন। ভয়ানক অসন্তুষ্ট হইয়া রেসিডেণ্ট, প্রধান সেনাপতি ও বড়লাটের নিষেধ সত্ত্বেও, নিজের দায়িত্বে সৈন্য পাঠাইয়া মুলতানে যুদ্ধ বাধাইয়া

দিলেন। মূলরাজকে বাধ্য হইয়া যোদ্ধার বেশে মূলতান রক্ষা করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইতে হইল ; কিন্তু তিনি মূলতান রক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত হইলেন এবং তাঁ'র সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইল।

হাজারা জিলার শাসনকর্ত্তা সর্দ্দার ছত্র সিংহ শিখ-সমাজে একজন বিশিষ্ট ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। বৃটিশ রেসিডেণ্ট শুধু সন্দেহে, বিনাপ্রমাণে ও বিনা-বিচারে, তাঁ'কে পদচ্যুত করিয়া তাঁ'র সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিলেন।

সর্দ্দার ছত্র সিংহের পুত্র ইতিহাস বিখ্যাত বীর শের সিংহ পিতার অপমানের প্রতিশোধ লইয়া রণজিৎ সিংহের স্বাধীন পাঞ্জাবকে স্বাধীন রাখিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ৬০টি কামান ও ৩০,০০০ সৈন্য লইয়া তিনি চিলিয়ান্-ওয়ালার নিকট শিবির সংস্থাপন করিলেন। এই সমরক্ষেত্রে শিখের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে সেনাপতি শের সিংহ যে অপরিসীম বীরত্ব ও যুদ্ধ-কৌশল প্রদর্শন করেন তা'তে ইংরাজের প্রধান সেনাপতি লর্ড গফ্ তাঁ'র জীবনের কঠোরতম বিপদে পতিত হ'ন এবং ইংরাজ সৈন্য সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন, বিধ্বস্ত ও পরাজিত হয়।

সেনাপতি শের সিংহ যে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তা'র তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে অত্যন্ত বিরল। ইংরাজের কামান, অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্র এবং ইংরাজের গর্ব্বোদ্ধত পতাকা সে-দিন শিখের করায়ত্ত হইয়াছিল। কিন্তু অদৃষ্টের পরিবর্ত্তনে ইহার পরই গুজরাট্ নামক স্থানে ইংরাজের সহিত যুদ্ধে শের সিংহ পরাজিত হ'ন। বন্দী হইয়াও শিখ সর্দ্দারগণ ইংরাজ সেনাপতির সাম্‌নে দাঁড়াইয়া বলেন,—"দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই আমাদের বীর যোদ্ধাগণ আজ মৃত্যু আলিঙ্গন করিয়াছে। আমরা বন্দী হইয়াছি বটে, কিন্তু সেজন্য আমরা দুঃখিত নই। আমরা যা' করিয়াছি, যদি ক্ষমতা হয়, আবার তা'ই-ই করিব।"—শিখ বীরপুরুষদের এই বীরত্বের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই।

লর্ড ডাল্‌হৌসি এই সময়ে ভারতের ভাগ্যবিধাতা। তাঁ'রই প্রতিনিধি ইলিয়ট্-সাহেব তখন লাহোর দরবারে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি মহারাজ দলীপ সিংহকে জানাইলেন যে, তাঁ'র পাঞ্জাব-রাজ্য ইংরাজ কোম্পানীর হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। দেওয়ান দীননাথ অত্যন্ত দীনতার সহিত জানাইলেন, তা' হইতেই পারে না, কারণ, কোম্পানীর সঙ্গে যে সন্ধি হইয়াছে তা'তে দলীপ

সিংহ সাবালক না হওয়া পর্য্যন্ত কোম্পানী তাঁ'র রাজ্য রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত। কিন্তু এ কথা শোনে কে? সশস্ত্র ইংরাজ সৈন্য দণ্ডায়মান রহিল, মুহুর্মুহুঃ তোপধ্বনি হইতে লাগিল, লর্ড ডাল্‌হৌসির ঘোষণাপত্র পাঠ করা হইল, রণজিৎ সিংহের দুর্গে ইংরাজের জাতীয় পতাকা ইউনিয়ন্ জ্যাক্ সদম্ভে উড়িল, আর মাত্র এগারো বৎসরের বালক মহারাজ দলীপ সিংহ রাজ্যচ্যুত হইলেন।

জগদ্বিখ্যাত কোহিনুর হীরক লর্ড ডাল্‌হৌসি এই বালক দলীপ সিংহের নিকট হইতেই লাভ করেন। দলীপ সিংহ এবং রাজপরিবারের সকলের জন্য মোট চারি লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইল। লাহোর দরবারে যাঁ'রা বিশ্বাসী সভ্য ছিলেন, লর্ড ডাল্‌হৌসি তাঁ'দিগকে বলিলেন যে, তাঁ'রা যদি পাঞ্জাব অধিকার ও দলীপ সিংহের রাজ্যচ্যুতিতে মত না দেন, তবে তাঁ'দের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে। এমনি করিয়া ভয় দেখাইয়া লাহোর দরবারের সভ্যদের মত গ্রহণ করা হইল।

দলীপ সিংহের বৃত্তি কমাইয়া দেড় লক্ষ টাকা মাত্র করিয়া তাঁ'কে ফতেগড়ে রাখা হইল। তা'র পর কোমল-মতি বালককে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া ইংলণ্ডে পাঠানো

হইল। শেষে প্যারিস নগরে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। আর যাঁ'র রাজভাণ্ডারের ঐশ্বর্য্য ছিল পৃথিবীবিখ্যাত কোহিনুর, খাল্‌সা শিখের বরণীয়া, পূজনীয়া সেই মহারাণী ঝিন্দন হতাশচিত্তে সন্তানের কাছে উপস্থিত হইতে বাধ্য হইলেন। "* * * বারিধিবেষ্টিত অপরিচিত, অজ্ঞাত ও নির্জ্জন স্থানে প্রাণাধিক তনয়ের পার্শ্বে মহারাজ রণজিৎ সিংহের এই রাজ্যভ্রষ্ট, শ্রীভ্রষ্ট মহিষীর জীবনস্রোতঃ অনন্ত কালসাগরে মিশিয়া গেল।"

এবার ডাল্‌হৌসি তাঁ'র সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা মিটাইবার জন্য এক নূতন আইন প্রণয়ন করিলেন। যে সমস্ত সামন্ত-রাজা নিজস্ব-পুত্রের অভাবে দত্তক-পুত্র গ্রহণ করিবেন, সেই দত্তকগ্রহণ যদি বৃটিশ সরকারের অনুমোদিত না হয়, তা' হইলে সেই সমস্ত সামন্ত-রাজ্য বৃটিশরাজ্যভুক্ত হইবে। এই আইনের বলে প্রথমেই সেতারা-রাজ্য বৃটিশরাজ্যের অন্তর্ভূত হইল। এই সেতারা ছত্রপতি শিবাজীর সেতারা। এই সেতারার দুর্গ হইতেই শিবাজী তাঁর গুরু রামদাস স্বামীকে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া, সমস্ত মহারাষ্ট্ররাজ্য একদিন তাঁ'রই চরণে অর্পণ করেন, এবং গৈরিক পতাকা উড়াইয়া বৈরাগীর উত্তরীয় সযত্নে ধারণ করেন। যে হিন্দুকুলসূর্য্য ছত্রপতির

তূর্য্যনিনাদে একদিন দুর্দ্ধর্ষ মোগল বাদশাহ পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেই মহাপুরুষের সেতারা লর্ড ডাল্‌হৌসির লেখনীর আঘাতে বৃটিশরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। মারাঠাবীর শিবাজীর বংশধর প্রতাপসিংহকে নৈশ অন্ধকারে বিনাবিচারে বারাণসীতে নির্ব্বাসিত করিয়া এবং তাঁ'র সমস্ত ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া ডাল্‌হৌসি সেতারা অধিকারের পথ নিষ্কণ্টক করিলেন।

বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত ঝাঁসি নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। তখন ঝাঁসির রাজা ছিলেন গঙ্গাধর রাও। ১৮৫৩ অব্দে তিনি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া বৃটিশ রেসিডেণ্টের সমক্ষে একটি দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি রেসিডেণ্টকে লিখেন যে, ইংরাজ সরকারের সহিত সন্ধি অনুসারেই তিনি দত্তক-পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন; যদি তিনি ব্যাধির কবল হইতে রক্ষা পা'ন এবং যদি তাঁ'র নিজস্ব-পুত্র জন্মে, তা' হইলে তখন যা' করিতে হয় তিনি করিবেন,—আর যদি তিনি না বাঁচেন, তবে যেন কোম্পানী অনুগ্রহ করিয়া তাঁ'র স্ত্রী লক্ষ্মীবাঈ ও ঐ দত্তক-পুত্রকেই রাজ্যের মালিক বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাঁ'দিগকে রক্ষা করেন।

আবেদন-নিবেদন ও যুক্তিতে লর্ড ডাল্‌হৌসি টলিলেন না; তিনি ঝাঁসিরাজ্য বৃটিশরাজ্যভুক্ত করিবার আদেশ

প্রচার করিলেন। বীরাঙ্গনা প্রাতঃস্মরণীয়া লক্ষ্মীবাঈ ঝাঁসি-রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য সন্ধির দোহাই দিলেন, বহু যুক্তির অবতারণা করিলেন. কত বন্ধুত্বের নিদর্শন দিয়া প্রার্থনা-পত্র প্রেরণ করিলেন, কিন্তু তাঁ'র সমস্ত প্রয়াসই ব্যর্থ হইল। যখন কিছুতেই কিছু হইল না, তখন বীরজায়া বীরদর্পে বৃটিশ প্রতিনিধিকে (Agent) বলিলেন—"মেরি ঝাঁসি দেঙ্গে নেহি।" (আমার ঝাঁসি দিব না।) তাঁ'র এই বজ্রনিনাদে বৃটিশ প্রতিনিধিকেও স্তম্ভিত হইতে হইল। শক্তিশালী কোম্পানী ঝাঁসি অধিকার করিলেন, বীরাঙ্গনার হৃদয়ে এই অবমাননার জ্বালা তুষানলের মত জ্বলিতে লাগিল।

সেতারা ও ঝাঁসি অধিকার করিয়া ডাল্‌হৌসির শ্যেন-দৃষ্টি পড়িল নাগপুর-রাজ্যের উপর। ১৮২৬ অব্দে কোম্পানী নাগপুরের রাজা রঘুজী ভোঁসলার সঙ্গে সন্ধি করেন এবং এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাঁ'র রাজ্য পুরুষানুক্রমে ভোঁসলা-বংশের অধীনেই থাকিবে। ১৮৫৩ অব্দে তৃতীয় রঘুজীর মৃত্যু হইলেই তাঁ'র জ্যেষ্ঠা মহিষী একটি দত্তক-পুত্র গ্রহণ করেন। কিন্তু ডাল্‌হৌসির বুভুক্ষা তখন সর্ব্বগ্রাসী। এমন কি সেনাপতি লো-সাহেব পর্য্যন্ত নাগপুরের স্বাধীনতা রক্ষায় উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু তা' হইলে কি হয়?

ডাল্‌হৌসির পরওয়ানা বাহির হইল যে, নাগপুর-রাজ্য কোম্পানীর রাজ্যভুক্ত হইবে। অনেক নিরপেক্ষ ইংরাজও ইহাকে অবিচার বলিয়া ঘোষণা ও ইহার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। ডাল্‌হৌসি কি রকম নিঃস্বার্থ তা' তাঁ'র নিজের লেখাতেই প্রকাশ পাইয়াছে —"আমরা ৮০,০০০ বর্গ মাইল পরিমাণের ও বার্ষিক ৪০ লক্ষ টাকা আয়ের একটি ভূসম্পত্তি লাভ করিব। * * * যে সমস্ত প্রদেশ ভিন্ন রাজ্য দ্বারা অন্তরিত রহিয়াছে, নাগপুর অধিকৃত হইলে তৎসমুদয় সংযোজিত হইয়া যাইবে। * * এক কথায় নাগপুর অধিকৃত হইলে সৈনিকবলের একত্র সমাবেশ হইবে, বাণিজ্য-ক্ষেত্র প্রসারিত হইবে, এবং আমাদের ক্ষমতা অপেক্ষা-কৃত সুদৃঢ় হইবে।"—অন্তরে এই গূঢ় উদ্দেশ্য, অথচ তিনি অন্যত্র জানাইয়াছেন যে, নাগপুরের উপকার করাই তাঁ'র একান্ত ইচ্ছা!

এই সুমহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়োজনেই নাগপুর-রাজ্যের স্বত্বত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করাইবার জন্য রঘুজীর বিধবা পত্নীকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনা হয়। যেমনি স্বাক্ষর লওয়া হইল, অমনি নাগপুরের সৈন্যদের নিরস্ত্র করিয়া বৃটিশ সৈন্য আমদানী করা হইল। তা'র পর

রাজার সমস্ত জিনিষই বাজেয়াপ্ত করা হইল। মণি-মুক্তা, সোনা-রূপা, কিছুই রহিল না। রাণীদের শয্যার নীচে যে সোনারূপা ছিল তা'ও খানাতল্লাসী করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। তাঁ'রা নানা সৎকার্য্যে যে সকল অর্থদান করিয়াছিলেন তা'ও বাজেয়াপ্ত হইল। "জগৎ বিস্ময়-স্তম্ভিত হইয়া, এই শোচনীয় অভিনয় চাহিয়া দেখিল, নীতি যথেচ্ছাচারের প্রভাবে পরিম্লান হইয়া অবনত মস্তক হইল, ধর্ম্ম পাপের প্রশ্রয় দেখিয়া দূরে পলায়ন করিল।" এমন কি বৃটিশ রেসিডেণ্ট মান্‌সেল্-সাহেব পর্য্যন্ত বলিয়া-ছিলেন যে, মণিমুক্তায়, সোনারূপায় প্রায় পঁচাত্তর লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাজ-পরিবারের নিকটই থাকা উচিত, কারণ, ঐ ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে তাঁ'দেরই সম্পূর্ণ অধিকার। কিন্তু রেসিডেণ্টের এই কথায়ও লর্ড ডালহৌসি কর্ণপাত করেন নাই। বহু নিরপেক্ষ ইংরাজ ঐতিহাসিকও এই ব্যাপারকে অত্যন্ত ঘৃণার্হ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আর এক কথা। নাগপুর তুলার জন্য বিখ্যাত। ম্যাঞ্চেষ্টারের বস্ত্র-ব্যবসায়ের অত্যধিক সুবিধা করিয়া ভারতবর্ষে তা'র বাণিজ্যের প্রসার করাও ডালহৌসির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল—ইহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

ইহার পরেই তাঁ'র দৃষ্টি পড়িল, দক্ষিণ ভারতের হায়দরাবাদের নিজামের রাজ্যের উপর। কোম্পানীর সহিত বন্ধুত্ব রক্ষার জন্য, সামন্ত-সন্ধি (subsidiary alliance) অনুসারে, নিজাম ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত একদল বৃটিশ সৈন্যের ব্যয়ভার বহন করিলেন। ক্রমে তিনি ঋণ-জালে জড়িত হইয়া পড়িলেন এবং এই ঋণ বর্দ্ধিত হইয়া আটাত্তর লক্ষ টাকা হইল। এই ঋণ আদায়ের জন্য লর্ড ডাল্‌হৌসি নিজামের ভূসম্পত্তি গ্রাস করিতে প্রস্তুত হইলেন। নিজাম অনেক যুক্তির অবতারণা করিয়া ন্যায়বিচার চাহিলেন, সন্ধির কথা বার বার স্মরণ করাইয়া দিলেন; কিন্তু সবই অরণ্যে রোদন হইল। কারণ, বেরার প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে তুলা জন্মে, ম্যাঞ্চেষ্টারের সুবিধা করিবার জন্য তাহা হস্তগত করা একান্ত প্রয়োজন। ১৮৫৩ অব্দে লর্ড ডাল্‌হৌসি একরূপ জোর করিয়াই নিজামের রাজ্যের সমস্ত উত্তর বেরার বিভাগ, রাইচোর-দোয়াব, আমেদনগর ও শোলা-পুরের খানিক অংশ বৃটিশরাজ্যভুক্ত করিলেন।

এবার তাঁ'র লোলুপদৃষ্টি পড়িল, তাঞ্জোর-রাজ্যের উপর। তাঞ্জোরের রাজা ছিলেন শিবাজী। তাঁ'র মৃত্যুর পর তাঁ'র কন্যাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইতে পারেন

বলিয়া বৃটিশ রেসিডেণ্ট পর্য্যন্ত স্বীকার করেন, এবং যা'তে শিবাজীর কন্যা তাঞ্জোরের সিংহাসন প্রাপ্ত হ'ন সেই জন্য লর্ড ডাল্‌হৌসিকে লিখেন। কিন্তু ডাল্‌হৌসি কোন কথা না শুনিয়া তাঁ'র চিরন্তন নীতি অনুযায়ী-ই কাজ করিলেন।

১৮১৮ অব্দে দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধে পেশোয়া বাজীরাও কোম্পানীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন। কোম্পানী তাঁ'র রাজ্য গ্রহণ করিয়া তাঁ'কে বার্ষিক আট লক্ষ টাকা বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করিলেন। কানপুর হইতে বারো মাইল দূরে বিঠুর নামক স্থানে পেশোয়ার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। শেষে এই নির্জ্জন স্থানেও পেশোয়ার অনুগত বহু মারাঠা গিয়া বাস করিতে লাগিল। তাঁ'র বিশ্বস্ততায় নির্ভর করিয়া কোম্পানী তাঁ'কে সেইখানেই একটি জায়গীর দিলেন। তিনি বরাবরই কোম্পানীর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কাবুল যুদ্ধে অর্থাভাবে যখন কোম্পানীর ত্রাহি ত্রাহি ডাক উঠে, তখন এই হৃতরাজ্য বাজীরাও পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়া সাহায্য করেন; পাঞ্জাবে খাল্‌সা শিখ যখন প্রবল হুঙ্কারে কোম্পানীর রাজ্য অধিকার করিতে অগ্রসর হয়, তখন নিজের ব্যয়ে এক হাজার অশ্বারোহী ও এক হাজার পদাতিক দিয়া এই বাজীরাওই কোম্পানীকে আসন্ন পতনের হস্ত হইতে রক্ষা করেন।

IMPERIAL

বাজীরাও অপুত্রক ছিলেন। তিনি দত্তক-পুত্র গ্রহণ করিয়া, তাঁ'কেই পেশোয়া উপাধি এবং বার্ষিক বৃত্তি দেওয়া হয়, এই জন্য কোম্পানীর নিকট আবেদন করিলেন। কিন্তু এত উপকার পাইয়াও কোম্পানী তাঁ'র আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন। বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর এই দত্তক-পুত্রই তাঁ'র বহু পরিজন ও দাসদাসীর সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁ'র নাম ছিল ধুন্দুপন্থ; কিন্তু সিপাহী যুদ্ধের ঘটনায় তাঁ'কে নানাসাহেব বলিয়াই অভিহিত করা হইয়াছে। নানাসাহেবের মত চরিত্রবান যুবক খুবই বিরল। তিনিও তাঁ'র পিতার বৃত্তি পাওয়ার জন্য কোম্পানীর নিকট আবেদন, নিবেদন ও দরবার করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিলেন না। বিঠুরের বৃটিশ কমিশনারও তাঁ'র দাবী অনুমোদন করিলেন; কিন্তু ডালহৌসি স্থিরসঙ্কল্প—তিনি সে বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিলেন।

উপায়ান্তর না দেখিয়া বহু যুক্তি-তর্ক, শাস্ত্র ও নীতির অবতারণা করিয়া নানাসাহেব কোম্পানীর ইংলণ্ডস্থ ডিরেক্টর সভার নিকট আবেদন করিলেন। কিন্তু ডিরেক্টরগণও ইহাতে কর্ণপাত করিলেন না।

কোম্পানীর অযোধ্যা অধিকারও দেশবাসীর মনে অসন্তোষ ও আশঙ্কা সৃষ্টি করিয়াছিল। অযোধ্যার নবাব

সুজাউদ্দৌলা কোম্পানীর মিত্র ছিলেন ; কিন্তু সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া কোম্পানী নবাবের সহিত এক সন্ধি করিয়া স্থির করিলেন যে, নবাব ৩৫,০০০-এর বেশী সৈন্য তাঁ'র রাজ্যে রাখিতে পারিবেন না। কোম্পানীর সহিত এই বন্ধুত্বই নবাবের কাল হইল।

অযোধ্যা বিরাট রাজ্য, ইহাতে বহু দুর্গ, বহু নগর ও বহু লোক রহিয়াছে। কাজেই কোম্পানী অযোধ্যা অধিকার করিতে বড়ই অভিলাষী হইয়া উঠিলেন। তখন অযোধ্যায় বর্গীর হাঙ্গামা আরম্ভ হয়। এই হাঙ্গামা হইতে নবাবকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁ'র সঙ্গে কোম্পানী পুনরায় এক সন্ধি করিলেন ; এই সন্ধি অনুসারে কোম্পানী চুণার দুর্গ ও এলাহাবাদ গ্রহণ করেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস্ নবাবের নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার জন্য ফন্দী আঁটিতে লাগিলেন। "৫০ লক্ষ টাকা লইয়া এলাহাবাদ এবং কোরা এই দুইটি জিলা নবাবের নিকটই বিক্রয় করা হইল।" ইহা ছাড়া "যে সমস্ত বৃটিশ সৈন্য নবাবের সাহায্যার্থ যাইবে, তাহার প্রত্যেক দলের নিমিত্ত নবাব প্রতিমাসে ২,১০,০০০ সিক্কা টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।"

নবাবের মৃত্যুর পর তাঁ'র পুত্র ও পৌত্রের সময়ে

কোম্পানী এক একটি সন্ধি করিতে লাগিলেন, আর বারাণসী, জৌনপুর, গাজীপুর প্রভৃতি এক একটি বিভাগ কোম্পানীর কবলে যাইতে লাগিল। এ দিকে বৃটিশ সৈন্যের খরচও বার্ষিক ছিয়াত্তর লক্ষ টাকা হইল। ইহাতেও কোম্পানীর সাধ মিটিল না। এইবার লর্ড ওয়েলেস্‌লি আসিয়া নবাব সাদত আলির সহিত এক সন্ধি করিলেন। ইহাতে স্থির হইল, নবাবকে একটা বার্ষিক বৃত্তি দেওয়া হইবে, তিনি রাজত্ব ছাড়িয়া দিবেন,—কিংবা বৃটিশ সৈন্যের খরচের জন্য অর্দ্ধেক রাজ্য দিবেন। নবাব রাজ্যের অর্দ্ধেকটা দিয়াই বন্ধুত্ব রক্ষা করিলেন। সাদত আলির মৃত্যুর পর, নেপাল যুদ্ধের সময়, তাঁ'র পুত্র কোম্পানীকে এক কোটি টাকা দিয়া বন্ধুত্ব বজায় রাখিলেন। যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কোম্পানী তাঁ'র কাছে আরও এক কোটি টাকা ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিয়া বন্ধুত্ব পাকা করিলেন। ১৮৩৭ অব্দে মহম্মদ আলি শাহ নবাব হইলে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড তাঁ'র সহিত এক সন্ধি করিয়া স্থির করিলেন যে, নবাবের রাজ্যে শৃঙ্খলার অভাব ঘটিলে কোম্পানী শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া রাজ্য আবার নবাবের হাতে দিয়া বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবেন।

তা'র পর আসিলেন, লর্ড ডাল্‌হৌসি। অমনি হঠাৎ

শৃঙ্খলার অভাব ঘটিয়া বসিল,—কাজেই সমগ্র অযোধ্যা-রাজ্য অধিকার করিয়া কোম্পানী বন্ধুত্বের সম্মান রাখিলেন। শেষ নবাব ওয়াজেদ আলির "ধনসম্পত্তি, গৃহসজ্জা, বস্ত্র, শকট, পুস্তকালয়স্থ দুই লক্ষ বহুমূল্য হস্তলিখিত পুস্তক, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি প্রকাশ্য নিলামে বিক্রীত হইল, এবং তদুৎপন্ন অর্থ মাননীয় কোম্পানীর ধনাগার পরিপূর্ণ করিল। * * * কর্ম্মচারিগণ অন্তর্মহলে প্রবেশ করিয়া বলপূর্ব্বক নবাবের বেগমদিগকে বাহিরে আনিল, বলপূর্ব্বক তাঁহা-দের দ্রব্যাদি প্রকাশ্য রাস্তায় নিক্ষেপ করিল।"—এমনি করিয়া অযোধ্যায় অসন্তোষ ও বিদ্বেষ জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল হইতে লাগিল।

ইহা ছাড়া উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ভূমির বন্দোবস্ত, তালুকদারী স্বত্বের লোপ এবং ভূমির ক্রোক আরম্ভ হওয়ায় দারুণ অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা তা'দের ইচ্ছামত ভূমির বন্দোবস্ত করিত। যে তালুকদারের দুই শত বিঘা জমি আছে, তা'র অধিকাংশ জমি কাড়িয়া লইয়া অন্য জমিদারের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া অর্থ গ্রহণ করিত। এমনি করিয়া সমস্ত তালুকদার নিঃস্ব হইয়া পড়িল। অনেকেরই সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় হইল—পুরুষানুক্রমে ভোগ-করা সম্পত্তি হস্তচ্যুত হইল।

মোগলদের সময়ে যা'রা তা'দের অনুগ্রহভাজন হইত, তা'রা প্রায়ই নিষ্কর ভূমি প্রাপ্ত হইত। এই নিষ্কর ভূমিকে লাখেরাজ বলা হইত। অনেকেই লাখেরাজ জমি পুরুষানুক্রমে ভোগ করিয়া আসিতেছিল। কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ লাখেরাজভোগীদিগকে দলিল দেখাইতে আদেশ দিল। বহু পুরুষ পর্য্যন্ত অনেকেই জমি ভোগ করিয়া আসিতেছিল, প্রায় কা'রও দলিল ছিল না, যা'দের ছিল তা'দেরও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কাজেই তা'দের এই নিষ্করজমি-ভোগ ঘুচিয়া গেল। অনেক চেষ্টা করিয়াও কেহই সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিল না। ইহাতেও কোম্পানীর বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও উত্তেজনা বাড়িয়াই উঠিল।

সারাদেশে অসন্তোষ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল; সিপাহীদের মধ্যেও কোম্পানীর প্রতি বিরাগ জন্মিতে লাগিল। ভারতীয় সৈন্যদের বেতন খুবই কম ছিল। কোম্পানীর জন্য প্রাণ দিয়া, কোম্পানীর রাজ্য বাড়াইয়া, তা'রা যা' আশা করিয়াছিল তা' পাইল না। এমন কি রাওয়ালপিণ্ডির দুই দল সৈন্য একবার বেতন গ্রহণ করিতেই অসম্মত হইল। চারিজন সৈন্য কিছুতেই বেতন গ্রহণে রাজী হয় নাই বলিয়া তা'দের প্রতি অতি কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা হইল; তা'দিগকে দ্বীপান্তরে কারা-

বাস করিতে হইল। নিতান্ত অল্প বেতনের প্রতিবাদ করায় এত বড় কঠোর দণ্ড হইল দেখিয়া, সকলের মনেই বিষম চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। এমন কি গোবিন্দগড়ের একদল সিপাহী দুর্গের দ্বার আক্রমণ করিল। তা'-দিগকে নিরস্ত্র করিয়া তা'দের স্থানে একদল গুর্খা সৈন্য নিযুক্ত করা হইল। সিপাহীরা বুঝিল, কোম্পানীর রাজ্য-জয়ে প্রাণ দিয়া সাহায্য করিয়া তা'দের কিছুই লাভ হয় নাই, বৃথা প্রাণপাত হইয়াছে মাত্র। এইরূপে সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিল।

কোম্পানীর সঙ্গে ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে ভারতীয় সিপাহী পাঠাইবার দরকার হয়। সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, চিরদিনের আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে, শাস্ত্রের অনুশাসনের বিরুদ্ধে, তা'দিগকে সমুদ্র পার করিয়া নেওয়া হইবে না; অথচ ব্রহ্মদেশে যাওয়ার জন্য সিপাহীদের উপর হুকুম আসিল। সিপাহীদের মন চঞ্চল ও উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

মোট কথা, ডাল্‌হৌসির সমবেদনার অভাব, স্বৈরাচার, অসীম রাজ্যলিপ্সা, কি হিন্দু কি মুসলমান, সকলকেই শত্রু করিয়া তুলিল। তা' ছাড়া সর্ব্বত্র খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার ও অনেক দেবত্র ও ব্রহ্মত্র জমির উচ্ছেদ হওয়াতেও

দেশের সকলেই অসন্তুষ্ট ও উত্তেজিত হইল। লর্ড ডাল্‌হৌসির কু-শাসনই ভারতব্যাপী বিদ্রোহের জন্য দায়ী। যখন নিতান্ত অন্যায় ভাবে কোম্পানী একে একে ভারতের রাজ্যগুলি গ্রাস করিতে লাগিলেন, স্বাধীন নৃপতিদের অনেকেই যখন হৃতরাজ্য ও কারারুদ্ধ হইলেন, তখন স্বভাবতঃই জনসাধারণের মধ্যে বিদ্বেষ ও বিদ্রোহবহ্নি ধিকি-ধিকি জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল।—তা'র পর বসাযুক্ত টোটার জনরবে ধূমায়মান বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। টোটায় গরু এবং শূকরের চর্ব্বি আছে শুনিয়া, কি হিন্দু কি মুসলমান, সকল সিপাহী-ই জাতিনাশ ও ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় উন্মত্ত হইয়া পড়িল, কাজেই তা'রা কোম্পানীকে ঘোর শত্রু বলিয়া মনে করিল। পূর্ব্ব-সঞ্চিত অগ্নিতে এই চর্ব্বিযুক্ত টোটা নূতন ইন্ধন জোগাইল মাত্র।

২

বিদ্রোহের নিদর্শন

১৮৫৭ অব্দের শীতের যায়-যায় আর বসন্তের আয়-আয়-এর মাঝখানে একদিন হঠাৎ বারাকপুরের টেলি-গ্রাফ ষ্টেশনে দাউ-দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তা'র পর প্রত্যহ রাত্রে একে একে ইউরোপীয় 'অফিসারদের' খড়ের চালার বাংলোগুলি পুড়িয়া পুড়িয়া ছাই হইতে লাগিল। চালাগুলিতে আগুন-যুক্ত তীর নিক্ষিপ্ত হইত। এই সময়ে বারাকপুরের সেনানিবাসে চারিদল ভারতীয় পদাতিক সৈন্য ছিল। জন হিয়ার্‌সে এই সমস্ত সৈনিকদলের সেনাপতি ছিলেন।

তখন রাণীগঞ্জেও একদল সিপাহী ছিল। সেখানেও প্রতিরাত্রেই এই অগ্নিকাণ্ড হইতে লাগিল। তীব্র অসন্তোষের এই সব নিদর্শন ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। বহরমপুরেও একটি সেনানিবাস ছিল, কিন্তু সেখানে ইউরোপীয় সৈন্য ছিল না। সেখানে সেনাপতি ছিলেন কর্ণেল মিচেল্‌। তিনি, সিপাহীদের মধ্যে টোটা লইয়া অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে শুনিয়া, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বজ্রনিনাদে কহিলেন যে, যা'রা সরকারের বিরুদ্ধা-

চারী, তা'দিগকে অত্যন্ত কঠোর দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। কর্ণেল মিচেল্ এমনই অধীরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, সিপাহীদের চাঞ্চল্য বাড়িয়াই গেল।

বাংলাদেশে তখন ইউরোপীয় সৈন্য খুব বেশী ছিল না, তাই রেঙ্গুন হইতে একদল ইউরোপীয় সৈন্য কলিকাতায় আনা হইল। ইহাতে সিপাহীদের উত্তেজনা আরও বাড়িল। সিপাহীদিগকে শান্ত করিবার জন্য, বারাকপুরের সেনাপতি হিয়ারসে তা'দিগকে কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত করিয়া এক লম্বা বক্তৃতা দ্বারা কোম্পানীর সাধু-উদ্দেশ্য বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলেন। কিন্তু শুধু বচনে সিপাহীরা সন্তুষ্ট হইল না। বরং তা'দের সন্দেহ, অসন্তোষ, আশঙ্কা ও ধর্ম্মনাশের ভয় এক সৈনিক-নিবাস হইতে আর এক সৈনিক-নিবাসে বিস্তৃত হইতে লাগিল।

এ-দিকে বহরমপুরের একদল সিপাহীকে নিরস্ত্র করা স্থির করিয়া সেনাপতি মিচেল্ তা'দিগকে লইয়া বারাকপুর রওনা হইলেন। সিপাহীরা এই গুপ্ত অভি-সন্ধির কিছুই জানিত না, পথে তা'রা কোন রকমের অবাধ্যতাও প্রকাশ করে নাই। কিন্তু কর্ণেল মিচেল্ যে-দিন বারাকপুরে পৌঁছিলেন, তা'র পূর্ব্বদিন বারাক-পুরের সিপাহীদের মধ্যে এক বিষম গোলযোগ ঘটিল।

বারাকপুরের সিপাহীদের মধ্যে মঙ্গল পাঁড়ে নামক একজন সচ্চরিত্র যুবক ছিল। সে যখন শুনিল যে, কলিকাতায় বহু গোরা সৈন্য আসিয়াছে, তখনই সে ভাবিল, দেশের সর্ব্বনাশের সময় উপস্থিত হইয়াছে। সে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, তরোয়াল ও গুলি-ভরা পিস্তল লইয়া বাহির হইল এবং অন্য সিপাহীদিগকেও তা'র পন্থা অবলম্বন করিতে বলিল।

সে-দিন রবিবার, সকলের বিশ্রামের দিন। খবর পাইয়া বগ্ নামে একজন ইংরাজ সৈনিক-কর্ম্মচারী তরোয়াল ও পিস্তল লইয়া, ঘোড়ায় চড়িয়া সেখানে উপস্থিত হইল। মঙ্গল পাঁড়ে তা'কে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িল, কিন্তু গুলি বগের গায়ে না লাগিয়া তা'র ঘোড়ার গায়ে লাগিল। ঘোড়া তৎক্ষণাৎ পড়িয়া গেল। বগ্ও তৎক্ষণাৎ উঠিয়া মঙ্গল পাঁড়ের দিকে গুলি ছুঁড়িল, গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল। বগ্ তখন তরোয়াল ধরিল। তখন আর একজন ইংরাজ সৈনিক-পুরুষও তরোয়াল লইয়া মঙ্গল পাঁড়েকে আক্রমণ করিতে আসিল। তখন একদিকে মঙ্গল পাঁড়ে, আর একদিকে দুই জন ইংরাজ সৈনিক পুরুষ। কিন্তু এই দুই জন ইংরাজ মঙ্গল পাঁড়ের আক্রমণ রোধ করিতে পারিল না, অসির আঘাতে

তা'দের দেহ ক্ষত-বিক্ষত হইতে লাগিল। এই সময়ে সেখ পল্টু নামে একজন মুসলমান সৈনিক হঠাৎ আসিয়া মঙ্গল পাঁড়েকে জড়াইয়া ধরিল। ইংরাজ দুই জন প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া গেল।

এই ব্যাপার যখন ঘটে, তখন একদল সিপাহী দূরে দাঁড়াইয়া ইহা দেখিয়াছিল। তা'রা নিরপেক্ষ ছিল। ইহা ছাড়া যে কুড়িজন সিপাহী ও একজন সুবাদার পাহারার কাজে নিযুক্ত ছিল, তা'রাও মঙ্গল পাঁড়েকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে নাই। তা'র সঙ্গে যোগ না দেওয়ার জন্য মঙ্গল পাঁড়ে তা'দিগকে ভীরু, কাপুরুষ ও দেশদ্রোহী বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিল। সে প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিল না, সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। যখন দেখিল যে, অন্য সিপাহীরা কিছুতেই তা'র সঙ্গে যোগ দিল না, তখন সে নিজেকে নিজে গুলি করিল এবং অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল।

তা'র পর সেই নিরপেক্ষ সিপাহীর দলকে নিরস্ত্র করিবার জন্য কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত করা হইল। তা'দের সাম্‌নে বহু কামান সাজাইয়া রাখা হইল এবং প্রেসিডেন্সী বিভাগের সমস্ত ইউরোপীয় সৈন্য অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান হইল। তা'দের সকলের সাম্‌নে সিপাহীদল

নীরবে তা'দের অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করিল এবং সামরিক বিভাগ হইতে বহিষ্কৃত হইল। অন্যান্য সিপাহীর দল ক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হৃদয়ে এই দৃশ্য চাহিয়া দেখিল। ভাবী বিপ্লবের পথ এই সব ঘটনায় প্রশস্ত হইয়া পড়িল।

মঙ্গল পাঁড়ে ভীষণ আহত হইয়াছিল, তা'র বাঁচিবার কোন আশাই ছিল না। সেই অবস্থায়-ই তা'কে ফাঁসি দেওয়া হইল; কিন্তু বীর যুবক এই অবস্থাতেও ধীরভাবে ফাঁসির রজ্জুতে মাথা বাড়াইয়া দিল। আর যে সুবাদার, আহত সেই ইংরাজ সৈনিক দুইটিকে সাহায্য করে নাই, বিচারে তা'রও ফাঁসি হইল।

এই সময় আম্বালার সেনানিবাসেও সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ ও আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রধান সেনাপতি আন্‌সন্ সিপাহীদের নিকট খুব জোর গলায় বক্তৃতা করিলেন; কিন্তু সিপাহীরা শান্ত হইতে পারিল না, কারণ প্রধান সেনাপতি কিছুতেই টোটার ব্যবহার স্থগিত রাখিতে রাজী হইলেন না। স্থগিত রাখিলে সরকারের 'প্রেষ্টিজ্' থাকে কি করিয়া? ইহাতে ফল হইল এই যে, বারাকপুরের মত প্রতিরাত্রেই এখানেও ইউরোপীয় সৈনিক-নিবাস, সিপাহী সৈনিক-নিবাস ও মাল-গুদামে অগ্নিকাণ্ড হইতে লাগিল। অসন্তোষ মূর্ত্ত হইয়া উঠিল।

ভারতের অন্যতম প্রধান সৈনিক-নিবাস মিরাটেও তীব্র অসন্তোষ দেখা দিল। মিরাটে তখন ১৮৫৩ জন ইউরোপীয় এবং ২৯২২ জন ভারতীয় সৈন্য ছিল। নূতন টোটা প্রস্তুত করিবার প্রধান কারখানা এইখানেই ছিল। অন্যান্য সেনানিবাসের সিপাহীরা, প্রধানতঃ মিরাটের সিপাহীরা কি করে—এই প্রতীক্ষাই করিতেছিল।

এই মিরাটেই তৃতীয় অশ্বারোহীদলের ৮৫ জন সিপাহী, সেনাপতি কর্ণেল স্মাইয়ের আদেশ অমান্য করিয়া, এপ্রিল মাসের শেষভাগে, টোটা স্পর্শ করে নাই। ক্রমে সমগ্র অযোধ্যায় জনসাধারণের মধ্যেও অসন্তোষ আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। অযোধ্যা অধিকার করিয়া কোম্পানী প্রাচীন অট্টালিকা সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন, নবাব ওয়াজেদ আলিকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন, ধর্ম্ম-মন্দির সকল সরকারের সম্পত্তি বলিয়া অধিকার করা হইয়াছিল, অতিরিক্ত হারে অত্যন্ত কঠোরতার সহিত রাজস্ব আদায় করা হইতেছিল, অনেক তালুকদার সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং অনেকেই কোম্পানীর উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল,—এবার তা'দের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হইল।

তৃতীয় অশ্বারোহীদলের অবাধ্যতার সংবাদ পাইয়া

সেনাপতি হিউয়েট্ কারণ অনুসন্ধানের আদেশ দিলেন। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, টোটায় অপবিত্র বস্তু রহিয়াছে বলিয়াই ৮৫ জন অশ্বারোহী তা' স্পর্শ করে নাই; তবু সামরিক বিচারালয়ে তা'দের বিচার হইল এবং ৮৫ জনের প্রত্যেকের দশ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হইল।

বিচার সম্বন্ধে অনেকের মনেই গভীর সন্দেহ জন্মিয়াছিল; কারণ, বিচারের বিবরণ বহুদিন প্রকাশ করা হয় নাই। তা' ছাড়া, বিচার আরম্ভ হওয়ার কয়েকদিন পূর্ব্বেই বিচারের ফল ইউরোপীয় কর্ত্তৃপক্ষ জানিতে পারিয়াছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষই এমনি করিয়া জনসাধারণের মধ্যে বিদ্বেষ বৃদ্ধি করিয়া বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছিলেন।

এ-দিকে বারাকপুরের সেই সিপাহীদলকে নিরস্ত্রীকরণের আদেশ বাহির হইল। প্রশস্ত কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত করিয়া, অন্যান্য সিপাহীদলের সম্মুখে, তা'দিগকে নিরস্ত্র করিয়া সামরিক বিভাগ হইতে নিষ্কাশিত করা হইল।

অযোধ্যায়, লক্ষ্ণৌ হইতে সাত মাইল দূরে, একদল সিপাহী অবস্থিতি করিতেছিল। নূতন টোটা ব্যবহার করিবার আদেশ তা'রাও অমান্য করিয়াছিল। এই সংবাদ পাইয়াই স্যর হেন্‌রি লরেন্স্ সন্ধ্যার পর বহু সৈন্য ও কামান লইয়া,

অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া লক্ষ্ণৌ হইতে বাহির হইলেন। প্রায় তিন ঘণ্টায় সাত মাইল পথ অতিক্রম করিয়া তিনি সিপাহীদের কাওয়াজের ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সিপাহিগণ চমকিত হইয়া উঠিল ; তা'র পর সশস্ত্র ইংরাজ অশ্বারোহী, বহু সশস্ত্র সৈন্য এবং কামান দেখিয়া তা'রা স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে, এই নৈশ অভিযান শুধু তা'দিগকে সায়েস্তা করিবার জন্য। তা'দিগকে কাওয়াজের ক্ষেত্রে আনা হইল এবং বহুক্ষণ ধরিয়া নিরস্ত্র করা হইল। পরে বিচারে তা'দের ৫০জনকে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া কারারুদ্ধ করা হইল, অপর সকলকে সামরিক বিভাগ হইতে বিতাড়িত করা হইল।

৩

বিদ্রোহের অগ্নিশিখা

মিরাট ও দিল্লী

ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই সিপাহীদের মধ্যে কোম্পানী-বিদ্বেষ ভৈরব-মূর্ত্তিতে দেখা দিল। বড়লাট লর্ড ক্যানিং শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য, যে-সমস্ত সৈন্য চীনে যাইতেছিল তা'দিগকে ভারতবর্ষে আনিলেন। আর বোম্বাই হইতে যে-সমস্ত সৈন্য পারস্যে গিয়াছিল, তা'রাও তখন দেশে ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

৯ই মে তারিখে মিরাটে তৃতীয় অশ্বারোহীদলের ৮৫ জনের কঠোর কারাদণ্ড হইয়াছিল। এই অতিশয় নির্ম্মম ব্যবহারে অন্য সিপাহীরা প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

১০ই মে প্রাতঃকালে দেখা গেল যে, ইউরোপীয়দিগের এই দেশীয় ভৃত্যেরা কেহই কাজে আসে নাই। অকস্মাৎ এই প্রথম সামান্য ভৃত্যেরা পর্য্যন্ত একযোগে নিয়ম ভঙ্গ করিল। দিন কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় হঠাৎ ভেরী আর বন্দুকের শব্দ এবং উত্তেজিত জনতার ভৈরব কোলাহল আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া তুলিল। উন্মত্ত

সিপাহীর দল সর্ব্বপ্রথমেই প্রবল পরাক্রমে কারাগারে প্রবেশ করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ ৮৫জন সহকর্ম্মীকে মুক্ত করিয়া আনিল।

ইউরোপীয় সৈনিক-নিবাস হইতে দেশীয় সৈনিক-নিবাস অনেক দূরে ছিল বলিয়া সিপাহীদের এই উত্তেজনা ও উন্মাদনার বিষয় ইউরোপীয়গণ জানিতে পারেন নাই। মিরাটে ভীষণ বিপ্লব আরম্ভ হইল। এই বিপ্লবে হিন্দু ও মুসলমান একমন একপ্রাণ হইয়াই কোম্পানীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। প্রায় সমুদয় সিপাহী-ই এ-বিপ্লবে যোগ দিয়াছিল। ইউরোপীয়গণ বিশেষ প্রমাদ গণিয়া আত্মরক্ষা ও স্ত্রীপুত্ররক্ষায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। উন্মত্ত সিপাহীদের গুলিবৃষ্টিতে অনেক ইংরাজের প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গিয়াছিল, অনেকে আত্মীয়-স্বজন লইয়া আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

এ-দিকে ইউরোপীয়দিগের আবাসগৃহ-সকলে দাউ-দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। রাস্তায়, মাঠে, ঘাটে নরশোণিত প্রবাহিত হইল। ঐতিহাসিকগণ বলেন—যদি সিপাহীদের শৃঙ্খলা থাকিত, অন্ততঃ একজন উপযুক্ত নায়কও থাকিত, তা' হইলে ইউরোপীয়দিগের পরিত্রাণের কোন উপায়ই থাকিত না। এ-দেশেরই বহু লোক, বহু বিপন্ন ইংরাজ পরিবারকে পলায়ন করিতে

সহায়তা করিয়াছিল, অনেককে অনেক রকমে রক্ষা করিয়াছিল। কাপ্তেন ক্রেগী, তাঁ'র স্ত্রী ও অন্যান্য কয়েকটি মহিলাকে লইয়া কৃষ্ণবর্ণ কাপড়ে গা' ঢাকা দিয়া এক জীর্ণ মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রায় সমস্ত রাত্রি ধরিয়া ইউরোপীয় হত্যা, ইউরোপীয়দের গৃহদাহ ও লুণ্ঠন চলিতে লাগিল। রাত্রিও শেষ হইতে চলিল, উন্মত্ত জনসাধারণ ও সিপাহিগণও আত্ম-গোপন করিতে লাগিল। দিবালোকে পলায়িত ইংরাজগণ আস্তে আস্তে মাথা তুলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, তাঁ'দের বহু বন্ধু-বান্ধবের মৃতদেহ, আর আবাসভূমির ভস্মস্তূপ। তাঁ'রা প্রতিহিংসা-গ্রহণে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন।

উন্মত্ত সিপাহীরা মিরাট হইতে দিল্লীর দিকে ছুটিল; আর ইংরাজগণ লুকাইবার স্থান হইতে বাহিরে আসিয়া দোকানদার ও পল্লীবাসীদের বিদ্রোহী সন্দেহ করিয়া ফাঁসি দিতে আরম্ভ করিলেন, এবং গুলি করিয়া মারিতে লাগিলেন। যাঁ'রা রাত্রিতে প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়াছিলেন, তাঁ'রাই সিপাহীদের অনুপস্থিতিতে প্রভাতকালে বীর সাজিয়া, শুধু সন্দেহের বশীভূত হইয়া হত্যাকাণ্ড করিতে লাগিলেন।

মিরাটের পর দিল্লীতে বিদ্রোহের ভেরী বাজিয়া উঠিল। মোগল বাদশাহদের দিল্লীর তখন অধঃপতন হইয়াছে। বাদশাহ শাহ আলম কোম্পানীর নিকট হইতে বার্ষিক ১০ লক্ষ টাকা বৃত্তি গ্রহণ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছিলেন। এই শাহ আলমই কোম্পানীকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁ'র মৃত্যুর পর তাঁ'র পুত্র আকবর শাহের সময়েও বাদশাহী ফর্‌মান ছাড়া কোম্পানী কোন নূতন প্রদেশ অধিকার করিতে পারিতেন না। তখনও ইংরাজ রেসিডেণ্ট্‌কে নগ্নপদে দূর হইতে কুর্ণিশ করিতে করিতে তাঁ'র কাছে আসিতে হইত, তখনও মুদ্রার উপর তাঁ'রই নাম অঙ্কিত হইত। কোম্পানী সময় ও সুযোগ বুঝিয়া একে একে তাঁ'র সম্মান লোপ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ১৮৩৬ অব্দে দিল্লীশ্বর সমস্ত রাজ-লক্ষণ হইতে বঞ্চিত হইয়া সামান্য বন্দীর মত রাজপ্রাসাদে বাস করিতে লাগিলেন। দারিদ্র্যগ্রস্ত আকবর শাহ নির্দ্দিষ্ট বার্ষিক বৃত্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য কত আবেদন-নিবেদন করিলেন, কোম্পানী তাঁ'র কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। আর কোনও উপায় না দেখিয়া, বিলাতে দরবার করিবার জন্য বাদশাহ একজন দূত পাঠাইলেন। এই বিখ্যাত

দূত বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী ও বাংলার নবযুগের প্রবর্ত্তক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়। সম্রাট আকবর শাহ-ই রামমোহনকে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত করিয়া বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু এই অসাধারণ শক্তিশালী মানবেরও সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ কোন কথাই শুনিলেন না। তা'র পর আকবর শাহের পুত্র বাহাদুর শাহের জীবিতাবস্থায়ই কোম্পানী স্থির করিলেন যে, তাঁ'র উত্তরাধিকারীর চিরন্তন স্বত্ব ত লোপ পাইবেই, এমন কি তাঁ'কে রাজোপাধিও রাখিতে দেওয়া হইবে না। কোম্পানীকে আশ্রয় দিয়া, কোম্পানীর বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দিয়া, কোম্পানীকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ দান করিয়া, দিল্লীর রাজবংশ শেষে এই পুরস্কার লাভ করিলেন! মোগল বাদশাহের এই শেষ পরিণতিতে দিল্লীর জনসাধারণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হইয়া উঠিল।

১০ই মে সন্ধ্যাকালে মিরাটের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করিয়াই, অশ্বারোহী ও পদাতিক সিপাহীরা অতি দ্রুতবেগে দিল্লীর দিকে ছুটিল, এবং ১১ই সকালবেলা যমুনার নৌসেতু পার হইয়া দিল্লীতে প্রবেশ করিল। টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া দিল্লীর ইউরোপীয়গণ

মিরাটের খবর কিছুই জানিতে পারেন নাই। এ-দিকে দিল্লীর বহু মুসলমান অধিবাসী এই সিপাহীদের দলে যোগ দিল। দিল্লীর সিপাহীরাও এই তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল। নগরময় একটা অভূতপূর্ব্ব উত্তেজনা দেখা দিল, বিরাট কোলাহলে বহু অধিবাসী ভয় পাইয়া আত্মগোপন করিল, বাজারের দোকানপাট বন্ধ হইয়া গেল।

তখন দিল্লীতে ৩৫০০ সৈনিক-পুরুষ ছিল এবং ৫২ জন ইংরাজ সেনা-সংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। দিল্লীর চারি-দিকই সুদৃঢ় প্রাচীর এবং প্রশস্ত ও গভীর পরিখাবেষ্টিত, নগরে প্রবেশ করিবার আটটি প্রবেশদ্বার বা তোরণ আছে।

উত্তেজিত সিপাহীর দল দিল্লী প্রবেশের পথে যে-সকল ইউরোপায়কে দেখিতে পাইল, তাঁ'দিগকে হত্যা করিল এবং তাঁ'দের গৃহে আগুন লাগাইয়া দিয়া কলিকাতা তোরণের দিকে ধাবিত হইল। তা'দের এই ঝড়ের মত বেগ ও যুদ্ধ-রবে বহু অধিবাসী উন্মত্ত হইয়া তা'দের সহিত যোগ দিল। সিপাহিগণ দিল্লীর রাজপ্রাসাদে গিয়া বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিল এবং তাঁ'র সাহায্য ভিক্ষা করিল। বাহাদুর শাহ সাহায্য করিলেন না। প্রাসাদে তখন প্রাসাদ-রক্ষী সৈনিকদের অধ্যক্ষ কাপ্তেন ডগ্‌লাস্ ও কমিশনার ফ্রেজার-সাহেব

ছিলেন। তাঁ'দের শত উপদেশ সত্ত্বেও প্রাসাদরক্ষক সৈনিকরা বিদ্রোহীদের সহিত যোগ দিল। তখন নিতান্ত বেগতিক দেখিয়া ফ্রেজার-সাহেব গাড়ীতে করিয়া পলায়ন করেন, আর ডগ্‌লাস্ প্রাসাদের পরিখায় লাফাইয়া পড়িয়া আহত হইয়া আত্মগোপন ও আত্মরক্ষা করেন। কয়েক-জন চাপরাসী তাঁ'কে সেখান হইতে তুলিয়া অতি কষ্টে তাঁ'র বাড়ীতে রাখিয়া আসে।

এইবার সিপাহীরা কাপ্তেন ডগ্‌লাসের গৃহ আক্রমণ করিল। প্রথমেই প্রবেশপথে তা'রা কমিশনার ফ্রেজার-সাহেবকে বধ করিল, তার পর উপরে উঠিয়া দরজা ভাঙিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরের মধ্যে ডগ্‌লাস্, হাচিন্‌সন্, এক পাদ্রী-সাহেব ও কয়েকজন ইউরোপীয় মহিলা ছিলেন ; কেহই পরিত্রাণ পাইলেন না।

দিল্লীর দরিয়াগঞ্জ নামক অঞ্চলে তখন ইউরোপীয়গণ বাস করিতেন। এই দরিয়াগঞ্জে প্রধান প্রধান ইউরোপীয় গণ বেলা দুই প্রহরের মধ্যেই নিহত হ'ন। তার পর উন্মত্ত সিপাহীরা দিল্লীর ব্যাঙ্ক লুঠ করে ; কর্ম্মচারীরা মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রাণ হারায়। এই সময় নগরের খৃষ্টানগণ নিহত, তা'দের সম্পত্তি লুণ্ঠিত এবং গৃহ ভস্মীভূত হইতে থাকে।

তখনও দিল্লীর সিপাহীরা প্রকাশ্যভাবে মিরাটের

সিপাহীদের সহিত যোগ দেয় নাই। দিল্লীর সৈনিকদল-সমূহের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার গ্রেব্‌স্ কর্ণেল রিপ্লের অধীনে একদল সৈন্য কাশ্মীর তোরণের দিকে পাঠাইলেন। এই সিপাহীদলের সহিত মিরাটের উন্মত্ত সিপাহীদের পথেই সাক্ষাৎ হইল। সেনাপতি গুলি ছুঁড়িবার হুকুম দিলেন, কিন্তু দিল্লীর এই সৈনিকদল এমনিভাবে গুলি ছুঁড়িতে লাগিল যে, মিরাটের সিপাহীদের কাহারও গায়ে লাগিল না। এ-দিকে মিরাটের সিপাহীরা কর্ণেল রিপ্লে ও আর চারিজন ইংরাজ সৈনিক-পুরুষকে নিহত করিল। তার পর মেজর পেটার্সন্, মেজর আবট ভিন্ন ভিন্ন সিপাহীদল ও কামান লইয়া কাশ্মীর তোরণে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু সেখানে বিদ্রোহীদের সহিত সাক্ষাৎ হইল না। এ-দিকে নগরের মধ্যে যে কি হইতেছে তা' ইংরাজ সেনাপতিরা সবিশেষ জানিতেই পারিলেন না।

দিন গেল, সন্ধ্যা হইয়া আসিল, ইংরাজ সেনাপতিগণ বিপক্ষের আক্রমণের প্রতীক্ষায় আছেন,—এমন সময় সমস্ত নগর কাঁপাইয়া এক ভীষণ শব্দ হইল, এবং ধোঁয়া ও অগ্নি-শিখা আকাশ স্পর্শ করিবার উপক্রম করিল। দিল্লীর বিখ্যাত অস্ত্রাগারে যে-সকল ইংরাজ ছিলেন, তাঁ'রা উপায়ান্তর না দেখিয়া বারুদের স্তূপে আগুন ধরাইয়া

অস্ত্রাগার উড়াইয়া দেন। ইহাতে মাত্র চার-পাঁচ জন ইংরাজের মৃত্যু হইল বটে, কিন্তু নগরের ভিন্ন ভিন্ন রাস্তায় চার-পাঁচ শত লোকের প্রাণ গেল।

দিল্লীসহর ও সেনানিবাসের মধ্যবর্ত্তী পাহাড়ের উপর একটি গোলঘর আছে, ইহাকে 'ফ্লাগ্‌ষ্টাফ্ টাওয়ার' বলা হয়। অনেক ইংরাজ পুরুষ ও মহিলা বালক-বালিকাসহ পলায়ন করিয়া এই গোলঘরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। দারুণ গ্রাষ্মে এই অতি সঙ্কীর্ণ গৃহে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে বাধ্য হওয়ায় অনেক মহিলা অবসন্ন হইয়া পড়েন। এখানে ইউরোপীয়দিগের চরম দুর্গতি হয়।

এ-দিকে কাশ্মীর তোরণে ইউরোপীয়গণ যে-বাড়ীতে ছিলেন, সেই বাড়ীর উপরে একদল সিপাহী গুলি চালাইতে থাকে। এই বাড়ীটিকে 'মেইন্ গার্ড' বলা হয়। যখন তিন-চার জন ইংরাজ 'অফিসার' নিহত হইলেন, তখন অবশিষ্ট ইংরাজদের পলায়ন ছাড়া অন্য উপায় রহিল না। 'মেইন্ গার্ড'-এর প্রাচীরের কোন কোন ঢালু জায়গা দিয়া ইংরাজপুরুষগণ কাপড় ও কোমরবন্ধ ইত্যাদির সাহায্যে নীচে ৩০ ফুট গভীর পরিখার মধ্যে নামিলেন। 'মেইন্ গার্ড'-এ বহু মহিলাও ছিলেন, তাঁ'দিগকেও নামাইয়া দেওয়া হইতে লাগিল, আর নীচের লোকেরা তাঁ'দিগকে ধরিতে

লাগিলেন। তার পর পরিখা হইতে বাহির হইয়া তাঁ'রা নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে আশ্রয় লইলেন, এবং শেষে জঙ্গল হইতে অন্য জায়গায় পলাইবার চেষ্টা করিলেন।

'মেইন্ গার্ড'-এর এই খবর পাইয়া, আত্মরক্ষার আর কোন উপায় নাই দেখিয়া, সন্ধ্যার প্রাক্কালে ব্রিগেডিয়ার গ্রেব্‌স্ গোলঘরে আবদ্ধ ইংরাজদিগকে পলায়ন করিবার আদেশ দিলেন। যিনি যে-ভাবে পারিলেন—গাড়ীতে, ঘোড়ায়, কিংবা পায়ে হাঁটিয়া—কেহ বা মিরাটের দিকে, কেহ বা কর্ণালের দিকে, পলায়ন করিতে লাগিলেন। কেহ বা সর্পসঙ্কুল, বহুদিনের পরিত্যক্ত জীর্ণ বাড়ীতে, কেহ বা গভীর জঙ্গলে আশ্রয় লইতে লাগিলেন। অনেকে পথের কষ্টে ও অনাহারে প্রাণত্যাগ করিলেন।

এই বিপন্ন ইংরাজগণ দিল্লীবাসী এবং পল্লীবাসী অনেকের দয়ায় ও সাহায্যে প্রাণরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। এমন কি সম্রাট্-বেগম জীন্নত্ মহলও প্রায় ৫০ জন ইংরাজকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। বহু ভারতবাসী নিজেদের জীবন ও সম্পত্তি বিপন্ন করিয়াও নিরুপায় পলাতক ইংরাজদিগকে বাঁচাইয়াছিল।

১৬ই মের পর দিল্লীসহরে কিংবা দিল্লীর সেনানিবাসে আর একজনও ইউরোপীয় রহিল না।

৪

বিদ্রোহের বিস্তার

মিরাট ও দিল্লীর সংবাদে কলিকাতার ইংরাজ ও ফিরিঙ্গি মহলে একটা মহাআতঙ্কের সৃষ্টি হইল। বড়লাট লর্ড ক্যানিংয়ের এক আইন প্রচারিত হইল। এই আইন অনুসারে যে কোনও ব্যক্তি সরকারের বিপক্ষতা করিবে, উকীল বা এসেসর্ না থাকিলেও, তা'র অপরাধের বিচার হইবে; ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশন বা কমিশনার এই বিচার করিবেন। তাঁ'রাই অপরাধীকে প্রাণদণ্ড, নির্ব্বাসন, কারাদণ্ড দিতে পারিবেন এবং তাঁ'দের আদেশই চরম আদেশ বলিয়া গণ্য হইবে।

এ-দিকে অম্বালায় ইউরোপীয় মহলেও মহাভয় দেখা দিল। সেখানে খবর আসিল যে, মুসোরীর গুর্খা সৈন্যদল প্রধান সেনাপতির আদেশ অমান্য করিয়াছে, তাঁ'র দ্রব্যাদি লুঠ করিয়াছে এবং খুব সত্বরই সিমলা আক্রমণ করিতে আসিতেছে। এ-সংবাদে সিমলার ইউরোপীয় মহলেও ত্রাহি ত্রাহি রব উঠিল। তাঁ'রা চারিদিকে শুধু বিপ্লবের করালমূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। গুর্খারা বেতন পায় নাই বলিয়া উত্তেজিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইউরোপীয়দিগকে

হত্যা করিবার কল্পনা কা'রও ছিল না ; অথচ সিমলার চারিশত শ্বেত নর ও নারী শিশুগণ সহ ব্যাঙ্কের গৃহে আশ্রয় লন এবং দুইটি কামান সজ্জিত রাখিয়া গুর্খাদের আক্রমণের প্রতীক্ষায় থাকেন। শেষে দেখা গেল যে, সবই অমূলক ; তখন সকলেই নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

বডলাটের অনুরোধ অনুসারে প্রধান সেনাপতি ইউরোপীয় সৈন্য সমাবেশ করিয়া দিল্লী উদ্ধারের জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই সময়ে ভারতবর্ষের মিত্ররাজগণ এবং প্রতিপত্তিশালী বহু ধনীলোক সর্ব্বস্ব দিয়া সরকারকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। পাতিয়ালা, ঝিন্দ, নাভার রাজগণ এবং কর্ণালের নবাব তাঁ'দের সর্ব্বস্ব দিয়া সরকারকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। এই সকল রাজা ও নবাবের সৈন্যগণ বহুস্থানে সমবেত হওয়ার ফলে, সেই সকল স্থানের উত্তেজিত জনসাধারণ শান্তভাব ধারণ করে।

২৫শে মে প্রধান সেনাপতি আন্‌সন্ সসৈন্যে অম্বালা হইতে যাত্রা করিলেন, কিন্তু পরদিনই ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি সৈন্য পরিচালনার ভার দিলেন সেনাপতি বার্ণার্ডের উপর। অম্বালা হইতে দিল্লী যাত্রায় ইউরোপীয় সৈন্যগণ তা'দের

'অফিসার'দের সম্মুখে পথের পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীবাসীদের ধরিয়া আনিয়া অতি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিতে লাগিল ; কারণ তা'দের উপর সৈন্যদের এই সন্দেহ হইয়াছিল যে, তা'রাই পলাতক ইংরাজদের দুর্দ্দশার মূল। মিরাটেও কর্ত্তৃপক্ষ সামরিক আইন প্রচার করিয়াছিলেন এবং শুধু সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া বহু নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে ফাঁসি দিয়াছিলেন।

বারাণসীর জনগণের মধ্যেও মিরাট ও দিল্লীর মত বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ১৮৫৭ অব্দে আহার্য্য সামগ্রী অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য হয়। সকলেরই বিশ্বাস হইয়াছিল যে, কোম্পানীর শাসনদোষেই খাদ্যদ্রব্য দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। দিল্লীর রাজবংশীয়দের মধ্যে যাঁ'রা এই সময়ে বারাণসীতে ছিলেন, তাঁ'রাও জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ প্রচার করেন। ইহার উপর নূতন বন্দুক ও টোটার প্রচলনে ধর্ম্মলোপ হইবার আশঙ্কায় হিন্দু ও মুসলমান—উভয়েই—উত্তেজিত হইয়া উঠে।

এই সময়ে বারাণসীতে তিন দল সৈন্য ছিল। এই তিন দলের সৈন্যসংখ্যা প্রায় দুই হাজার। ইংরাজ কামান-রক্ষকের সংখ্যা ছিল ত্রিশ। জর্জ্জ পন্‌সবি এই সৈন্যদলের অধিনায়ক ছিলেন।

জুন মাসের প্রথম ভাগে সিপাহীদের কতকগুলি

শূন্য গৃহে আগুন লাগে। এই সময়ে আজিমগঞ্জের সিপাহীদের মধ্যেও ঘোর উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। তা'রা নূতন টোটা ব্যবহার করিতে অসম্মত হয়। একদিন রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ভীষণ আতঙ্ক উপস্থিত হইল। তাঁ'রা কাছারী বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় লইলেন এবং চারিদিকে কামান স্থাপন করিয়া নিজেদের সুরক্ষিত করিলেন। উত্তেজিত সিপাহীরা দুই জন ইংরাজ সৈনিক-কর্ম্মচারীকে হত্যা করিল, এবং ইংরাজদের বাসগৃহ সকল ভস্মীভূত করিল, কারাগারে গিয়া কয়েদীদিগকে মুক্ত করিল ; কিন্তু তা'দের 'অফিসার'-দিগকে হত্যা করিল না। তা'রা সরকারের সাত লক্ষ টাকা লুঠ করিল।

আজিমগড়ের ইউরোপীয়গণ অত্যন্ত আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া সৈনিক-নিবাস, কাছারী বাড়ী ইত্যাদি সব শূন্য ফেলিয়া গাজীপুরে পলায়ন করিলেন। সিপাহীরা আসিয়া তাঁ'দিগকে না পাইয়া মহাউল্লাসে ফৈজাবাদের দিকে প্রস্থান করিল।

আজিমগড়ের এই সংবাদ পাইয়া বারাণসীর ইউরোপীয় মহল আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তাঁ'দের সাহায্যের জন্য সেনাপতি কর্ণেল নীল একদল মান্দ্রাজী

সৈন্য লইয়া বারাণসীতে উপস্থিত হ'ন। দানাপুর হইতেও একদল ইউরোপীয় সৈন্য তাঁ'দের সাহায্যের জন্য আসে। এইরূপে আত্মরক্ষার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ বারাণসীর সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করা স্থির করিলেন।

সিপাহীদিগকে কাওয়াজের স্থানে দণ্ডায়মান করানো হইল। তা'দের সম্মুখে কামান সকল স্থাপিত ছিল, এইবার একদল সশস্ত্র সৈনিকও দণ্ডায়মান হইল। যদি সিপাহীরা কোন রকমে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে, তবে তা'দিগকে কামান দিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইবে, ইহাই ছিল কর্ত্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য। ইহাতে সিপাহীদের সন্দেহ, আশঙ্কা ও উত্তেজনা আরও বাড়িয়া গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যেই সিপাহীরা বন্দুকে গুলি ভরিয়া ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিল। সাত-আট জন ইউরোপীয় সৈনিক নিহত হইল। ইংরাজ সৈনিকেরাও কামান দাগিতে লাগিল, কয়েকজন সিপাহী নিহত হইল। সিপাহীরা নগরে এবং নিকটবর্ত্তী লোকালয়ের এখানে-সেখানে বিক্ষিপ্ত থাকিয়া প্রতিশোধ লইবার চেষ্টায় রহিল।

সেনাপতি কর্ণেল নীল এইবার সিপাহীদের উপর পূর্ণ প্রতিশোধ লইতে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইলেন। "যে সকল সিপাহী আপনাদের আবাসগৃহে আশ্রয় লইয়াছিল তাহারা তাড়িত ও নিহত হইল। যাহারা নির্জ্জন কুটীরে

আত্মগোপন করিয়াছিল, তাহারা সেই সকল কুটীরের সহিত ভস্মীভূত হইয়া গেল।” বারাণসীতে সামরিক আইন প্রচারিত হইল। এই আইনের অপব্যবহারে বারাণসীর অধিবাসীদের চরম দুর্দ্দশা হইল। বহুলোকের ফাঁসি হইল, পল্লীতে পল্লীতে নির্ম্মম বেত্রাঘাত বেপরোয়া ভাবে চলিল। সারি সারি ফাঁসিকাষ্ঠে বহুলোকের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। ইংরাজ সৈনিক-কর্ম্মচারীরা বারাণসীর পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে প্রবেশ করিয়া তথাকার বহু অধিবাসীকে রাস্তার দুই ধারের গাছে গাছে ফাঁসি দিয়া লোকের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করিলেন।

কয়েকটি বালক সিপাহীদের পতাকা লইয়া ও টম্‌টম্‌ বাজাইয়া রাস্তা দিয়া খেলা করিতে করিতে যাইতেছিল। এই অপরাধে সামরিক বিচারালয়ের বিচারে এই কোমল-মতি বালকদের প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইল। নিরীহ বালকেরা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। একজন বিচারকও কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং দয়া প্রদর্শন করিবার জন্য সেনাপতিকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু অন্য বিচারপতিদের প্রাণ গলিল না, সেনাপতিও তাঁ’দের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন।

একজন অল্পবয়স্ক ইংরাজ সৈনিক পল্লীদাহ ও

নিষ্ঠুরতার একটি বর্ণনা দিয়াছেন। তাহা সংক্ষেপে এইরূপ—

"* * * ২৭শে জুন সন্ধ্যাকালে আমাদের দলের ২৪০ সৈনিক, (ইহাদের মধ্যে আমিও একজন) ১১০ শিখ ও ২০ জন সওয়ার বারাণসী হইতে যাত্রা করিল। আমরা ৩ দলে বিভক্ত হইয়া পল্লীসমূহে অপরাধীদিগের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি যে দলে ছিলাম সেই দল একটি পল্লীতে উপস্থিত হইল, পল্লীবাসীরা পল্লী ছাড়িয়া গিয়াছিল। আমরা উক্ত পল্লীতে আগুন লাগাইলাম, পল্লী ভস্মীভূত হইয়া গেল। * * * দুই মাইল দূরবর্ত্তী আর একটি পল্লীগ্রামে গেলাম। আমরা যখন তাহাদের নিকট হইতে ৬০০ হস্ত দূরে উপস্থিত হইয়াছিলাম তখন তাহারা দৌড়িতে লাগিল। আমরা তাহাদের উপর বন্দুক ছুঁড়িতে লাগিলাম, এবং তাহাদের ৮ জনকে গুলির আঘাতে ভূতলশায়ী করিলাম। * * * আরও ২০ জন আমাদের বন্দী হইল। একটি প্রাচীন লোক আমাদের নিকট আসিয়া আমরা যে গ্রাম দগ্ধ করিতেছিলাম, তাহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ টাকা চাহিল। আমাদের সহিত একজন ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। * * * তাঁহার এই বিষয়ের বিচার করিতে ৫ মিনিট মাত্র সময় লাগিল। সেই বৃদ্ধ গ্রামে

দুর্বৃত্তদিগকে আশ্রয় দিয়া খাদ্যসামগ্রী ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিল, ইহা তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। সেই বৃদ্ধ ও একজন সিপাহীকে সেই স্থানের একটি বৃক্ষের শাখায় ফাঁসি দেওয়া হইল। * * * পরদিন প্রাতঃকালে * * * আমরা আর একটি গ্রামে গমন করিলাম, এবং উহাতে আগুন লাগাইয়া গন্তব্য পথে ফিরিয়া আসিলাম। এই সময়ের মধ্যে অন্যান্য দলও নিষ্কর্ম্মা ছিল না, তাহারাও আমাদের ন্যায় এই সকল কার্য্য করিতেছিল। * * * আমরা ৮০ জনকে বন্দী করিয়াছিলাম, ৬ জনকে সেই দিন ফাঁসি দেওয়া হইল। ৬০ জনের বেত্রাঘাত দণ্ড হইল। * * * পরদিন এক গ্রামে উপস্থিত হইয়া আগুন দিলাম। * * * আমরা একটি বড় পল্লীতে আসিলাম। ঐ পল্লী লোকপূর্ণ ছিল, আমরা গ্রামের ২০০ জনকে অবরুদ্ধ করিয়া, উহাতে আগুন দিলাম। আমি গ্রামমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম, উহার চারিদিকই অগ্নিশিখায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। আমি দেখিলাম একটি বৃদ্ধ শয্যা হইতে হামাগুড়ি দিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহার হাঁটিবার সামর্থ্য ছিল না। * * * আমি খাটিয়া সমেত ঐ বৃদ্ধকে টানিয়া বাহির করিলাম। ইহার পর ঘুরিয়া একটি গলির মোড়ে

আসিলাম। অগ্নিশিখা ও ধূমরাশি ব্যতীত আর কিছুই আমার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইল না। আমি যখন ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছিলাম, তখন অগ্নির তেজে একখানি গৃহের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িল, আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম, প্রায় চারি বৎসর বয়স্ক একটি বালক গৃহদ্বারের দিকে আসিতেছে। * * * যে গৃহে বালকটি ছিল সেই দিকে ছুটিয়া গেলাম। গৃহদ্বার সেই সময়ে অগ্নিশিখায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল। আমি ছুটিয়া দ্বারে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, ভিতরে একটি ছোট উঠান আছে। উঠানের চারিপার্শ্বের সকল গৃহে আগুন লাগিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত নিরুপায় শিশুটি ব্যতীত তথায় আট হইতে দুই বৎসর বয়সের আরও ছয়টি শিশু দেখিতে পাইলাম, এতদ্ব্যতীত একটি অতি প্রাচীন ব্যক্তি ও প্রাচীনা স্ত্রীলোক ছিল। ইহারাও অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে হাঁটিতে পারিত না। একটি বিংশতি বর্ষীয়া যুবতী একটি শিশুকে বুকে জড়াইয়া রাখিয়াছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস শিশুটি ৫।৬ ঘণ্টা পূর্ব্বে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। * * * অগ্নি-শিখায় চারিদিক পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। * * * অনেক কষ্টে সকলকেই নিরাপদে বাহির করিলাম। * * * অনন্তর আর একস্থানে যাইয়া একটি স্ত্রীলোক দেখিতে পাইলাম; তাহার বয়স

প্রায় ২২ বৎসর। যুবতী একটি আসন্নমৃত্যু ব্যক্তির পার্শ্বে বসিয়াছিল। অগ্নি প্রবলবেগে অগ্রসর হইতেছিল। মৃত্যুশয্যাশায়ী ব্যক্তির অদূরে চারিটি নারী আমার দৃষ্টি-গোচর হইল। আমি দৌড়িয়া তাহাদের নিকট গেলাম এবং তাহাদিগকে ঐ পীড়িত ব্যক্তি ও যুবতীর সাহায্য করিতে বলিলাম। তাহারা আমার সহিত আসিল এবং ঐ মৃত্যুদশাগ্রস্ত ব্যক্তি ও যুবতীকে বাহিরে লইয়া আসিল। অগ্নি-শিখা গগনস্পর্শী হইয়াছিল, আমি গ্রামের আর একস্থানে যাইয়া ১৪০টি স্ত্রীলোক ও প্রায় ৬০টি শিশু-সন্তান দেখিতে পাইলাম। সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছিল। আমি এই পরিবারের যে প্রাচীনা স্ত্রীলোকটিকে বাহিরে আনিয়াছিলাম সে আমার নিকট আসিয়া সকলের বিমুক্তির জন্য যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। * * * এই সময়ে ভেরিধ্বনি দ্বারা সকলকে একত্র হইবার সঙ্কেত করা হইল। আমি ফিরিয়া গেলাম। * * * আমরা বন্দীদিগের দশজনকে ফাঁসি দিলাম। প্রায় ষাট জনের প্রতি বেত্রাঘাত দণ্ড হইল। সেই রাত্রিতে আমরা আর একটি পল্লী ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলাম। * * * ৬ই জুলাই আমাদিগকে ২০০০ যুদ্ধোন্মুখ লোকের বিরুদ্ধে

যাইতে হয়। আমাদের দলে ১৮০ জন সৈনিক ছিল। বিপক্ষেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া আমাদের গতি-রোধের জন্য দাঁড়াইয়া ছিল। আমরা তাহাদের অধ্যুষিত পল্লীতে অগ্নি দিয়া উহার চারিদিক পরিবেষ্টিত করিলাম। তাহারা যেমন অগ্নিশিখা হইতে মুক্ত হইবার জন্য বাহির হইতে লাগিল, আমরা অমনি তাহাদের প্রতি গুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। তাহাদের ১৮ জন আমাদের বন্দী হইল। এক কথায় সকলের বিচার হইয়া গেল। আমরা গুলি করিয়া তাহাদিগকে সেইস্থলে বধ করিলাম। আমরা এই বিভাগে পাঁচ শত লোককে এইরূপে নিহত করিয়াছিলাম।”

এই ভয়াবহ কঠোরতা বিদ্রোহ-বহ্নি নির্ব্বাপিত করিতে পারিল না, বরং ইহার জ্বালাময়ী শিখা আরও লেলিহান হইয়া ভারতের রাজনীতিক গগন গ্রাস করিল। অল্পকাল মধ্যেই জৌনপুর ও এলাহাবাদেও বিদ্রোহের দাবাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল।

আজিমগড় ও বারাণসীর সিপাহীদের বিদ্রোহের কথা জৌনপুরে প্রচার হইয়া পড়িল। ইউরোপীয়গণ কাছারী গৃহে আশ্রয় লইলেন। শিখ সৈন্যগণ তাঁ'দিগকে রক্ষা করিবার জন্য সজ্জিত হইয়া রহিল; কিন্তু ইউরোপীয়দিগের

হস্তে বারাণসীতে তা'দের স্বজাতীয় শিখদের হত্যার সংবাদে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল। কাছারীর বারান্দায় সেনানায়ক দণ্ডায়মান ছিলেন, হঠাৎ তাঁ'র বুকে একটি গুলি আসিয়া লাগিল। তিনি পড়িয়া গেলেন। ইউরোপীয়দের মধ্যে ভীষণ আতঙ্ক উপস্থিত হইল। জৌনপুরের জয়েণ্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেটও জেলখানার পথে এক গুলিতে নিহত হইলেন। শিখ সৈন্য ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া ২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা পাইল। জৌনপুরে শিখেরাই তখন হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা। ইউরোপীয়গণ আর কোন উপায় না দেখিয়া সেখান হইতে পলায়ন করিয়া কারাকট নামক স্থানে আসিলেন। বহু ভারতবাসী এই পলাতক ইউরোপীয়দিগকে নিজেদের গৃহে স্থান দিয়া এবং নানাভাবে লুক্কায়িত রাখিয়া সাহায্য করিল।

৫

এলাহাবাদ

একটা বিরাট অসন্তোষ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। মিরাটের ভয়াবহ কাণ্ডের সংবাদ ১৪ই মে বিশেষ বিবরণ সহ এলাহাবাদে পৌঁছিল। নগরের সর্ব্বত্র ইহা লইয়া আন্দোলন চলিল, আর ইউরোপীয়দের চক্ষের সম্মুখে বিপ্লবের যে করালছায়া ফুটিয়া উঠিল, তা'তে তাঁ'দের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। ইতিমধ্যে খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা আরও বাড়িয়া গেল। ইউরোপীয়গণ আত্মরক্ষায় প্রস্তুত হইয়া ৫ই জুন এলাহাবাদের দুর্গে আশ্রয় লইলেন।

বারাণসী হইতে এলাহাবাদে আসিতে হইলে এলাহাবাদের নিকটবর্ত্তী দারাগঞ্জের সাম্‌নে গঙ্গার একটি নৌসেতু পার হইয়া আসিতে হইত। কতকগুলি সিপাহীকে দুইটি কামান সহ এই নৌসেতু রক্ষা করিবার জন্য পাঠানো হইল। এই নৌসেতু ও এলাহাবাদের সৈনিক-নিবাস ইহার মাঝখানে এক দল অশ্বারোহী সৈন্য থাকিত। তা'রা যখন বারাণসীর

ব্যাপার শুনিল এবং সেনাপতি নীল-সাহেবের বীভৎস নিষ্ঠুরতার কাহিনী যখন তা'দের মন বিচলিত করিয়া তুলিল, তখন তা'রা প্রতিশোধ লইতে উদ্যত হইল।

৬ই জুন রাত্রি ৯টার সময় হঠাৎ ভেরী বাজিয়া উঠিল, সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। যা'রা নৌসেতু রক্ষার জন্য ছিল তা'রাই প্রথমে বিদ্রোহ প্রকাশ করে। তখনই অযোধ্যার 'অনিয়মিত' সৈন্যদল লইয়া একজন ইংরাজ অধিনায়ক বিদ্রোহ দমন করিতে আসিলেন। তিনি নিহত হইলেন এবং তাঁ'র সৈন্যদল বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিল। সিপাহীরা কামান দুইটি লইয়া কাওয়াজের ক্ষেত্রে আসিল। তা'দের অধিনায়ক কর্ণেল সিম্‌সন আসিয়া সেখানে কামান আনিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেই দুইজন সিপাহী তাঁ'র দিকে গুলি চালাইয়া ইহার উত্তর দিল। কর্ণেল-সাহেব বেগতিক দেখিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন। কয়েকজন বিশ্বস্ত সিপাহী তাঁ'কে এই সময়ে সাহায্য করে। তিনি দুর্গের দিকে ছুটিলেন। একজন সিপাহীর গুলিতে ঘোড়াটি আহত হইলেও সে দুর্গদ্বার পর্য্যন্ত তা'র প্রভুকে বহন করিয়া আনিয়া তা'র পর নিজে ভূতলশায়ী হইল। সিম্‌সন দুর্গে পলায়ন করিলেন, কিন্তু সিপাহিগণ যে ইংরাজকে

দেখিতে পাইল তাঁ'কেই নিহত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আটটি তরুণ ইংরাজ যুবক যুদ্ধ-বিভাগে কার্য্য করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, তাঁ'রাও নিহত হইলেন।

এদিকে কর্ণেল সিম্‌সন দুর্গে প্রবেশ করিয়াই দুর্গস্থিত সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিতে চাহিলেন। দুর্গের একস্থানে হিন্দুস্থানী সিপাহীরা সশস্ত্রেই দণ্ডায়মান ছিল, তা'দের সম্মুখে অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত শিখেরা আসিয়া দণ্ডায়মান হইল, ইংরাজ সৈনিক-পুরুষেরা কামান পাতিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিল; দুর্গের হিন্দুস্থানী সিপাহীরা শান্তভাবে অস্ত্র পরিত্যাগ করিল বটে, কিন্তু বাহিরে আসিয়া স্বজাতীয়দের সহিত সম্মিলিত হইল এবং বিদ্রোহের শক্তি বৃদ্ধি করিল। এই সময়ে যদি দুর্গের শিখসৈন্য ও সিপাহীরা পরস্পর মিলিত হইত, তা' হইলে দুর্গস্থিত ইউরোপীয়দের রক্ষা পাইবার উপায় থাকিত না; অথবা দুর্গের বাহিরের সিপাহীরা যদি সৈন্যনিবাস আক্রমণ করিত, তা' হইলেও ইংরাজদের পক্ষে সেই বিপ্লবের গতি রোধ করা অসম্ভব হইত।

সমস্ত রাত্রি লুঠ চলিল। সিপাহীরা কারাগারের দ্বার ভাঙিয়া কয়েদীদিগকে মুক্ত করিল। তা'র পর

তা'রা এবং উন্মত্ত জনসাধারণ ইউরোপীয়দের বাসস্থানের দিকে ছুটিল। পথে যে-সব ইউরোপীয়কে দেখিতে পাইল, তাঁ'দের নির্ম্মমভাবে হত্যা করিল; তাঁ'দের আবাসগৃহ সকল প্রচণ্ড অগ্নিশিখা লেহন করিয়া লইল। রেলওয়ের কারখানা ধ্বংস ও টেলিগ্রাফের তার ছিন্ন হইল।—দুর্গের বাহিরে যত ইউরোপীয় ছিলেন তাঁ'দের প্রায় সকলেই নিহত হইলেন।

পরদিন ৭ই জুন দিবা দ্বিপ্রহরে সিপাহীরা ধনাগার হইতে ত্রিশ লক্ষ টাকা লুঠ করিল। যে-সকল তালুকদারের ভূসম্পত্তি হস্তচ্যুত হইয়াছিল, তা'রাও কেম্পানীর শাসনের অবসান হইয়াছে মনে করিয়া পল্লীবাসী কৃষাণদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। ইহা ছাড়া, লিয়াকৎ আলি নামে একজন মৌলবীও মুসলমানদের মধ্যে তীব্র কোম্পানী-বিদ্বেষ প্রচার করেন। তাঁ'র জ্বালাময়ী বক্তৃতায় মুসলমানগণের হৃদয় উদ্বেলিত হইল। এমনি করিয়া নগরের বাহিরে সুদূর পল্লীগ্রামেও জনসাধারণের মধ্যে ঘোর অসন্তোষ ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হইল।

এমনি সময়ে, ১১ই জুন, সেনাপতি নীল সৈনিকদলসহ বারাণসী হইতে আসিয়া এলাহাবাদ দুর্গে প্রবেশ

করেন। তখন দুর্গের মধ্যে কোন সুনীতি বা সুশৃঙ্খলা ছিল না। যে-সকল ইংরাজ সখের সৈন্য হইয়াছিল তা'রা ও শিখেরা মাল-গুদাম লুঠ করিয়া ও নিয়ত সুরাপান করিয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে লাগিল। তা'রা দুর্গের দ্রব্যাদিও লুঠ করে। তা'দের তখন এমনি অবস্থা যে, তা'রা কোন দোষকেই দোষ বলিয়া মনে করে নাই।

এলাহাবাদের নিকটবর্ত্তী দারাগঞ্জ নামক স্থানে বহু বিদ্রোহী সিপাহী আছে এইরূপ সংবাদ পাইয়া সেনাপতি নীল একদল ইংরাজ সৈন্য ও কতকগুলি শিখ সেখানে পাঠাইলেন। ইহারা বিদ্রোহীদের বিতাড়িত করিয়া একটি পল্লীতে আগুন ধরাইয়া দিল। ইহার পর সেনাপতি শিখ সৈন্যদিগকে দুর্গের মধ্য হইতে বাহির করিয়া দিলেন। শিখেরা দুর্গের বাহিরে আসিয়া রহিল এবং অবাধে নগরবাসীদের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিতে লাগিল, আর যেখানে-সেখানে আগুন ধরাইতে লাগিল। এ-দিকে ইউরোপীয় মহিলা ও বালক-বালিকাদিগকে দুইখানি জাহাজে করিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল। তাঁ'দের সঙ্গে ১৭ জন বিশ্বস্ত রক্ষক ছিল। এই রক্ষকদের মধ্যে শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় নামে একজন বাঙ্গালীও ছিলেন।

এ-দিকে একটি জাহাজে কামান সাজাইয়া সেনাপতি নদীর দুই তীরস্থ পল্লীর দিকে গোলাবর্ষণে জনগণের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। নগরে এই সময়ে একটা জনরব উঠিল যে, ইংরাজগণ কামানের দ্বারা সমগ্র নগরই ধ্বংস করিবে। ভীতিবিহ্বল নগরবাসিগণ ঘরবাড়ী ত্যাগ করিয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। নগর জনশূন্য হইল।

১৮ই জুন সেনাপতি নীল সসৈন্যে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া, কয়েকটি পল্লীগ্রাম আক্রমণের জন্য একদল সৈন্য পাঠাইলেন, আর স্বয়ং একদল সৈন্য লইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। শান্তি, শৃঙ্খলা ও কোম্পানীর প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু রাজপুরুষ-গণের অনেকেই ইহাতে সুস্থ বোধ করিলেন না। বড়লাটের মন্ত্রীসভা এই সময়ে এমন একটি নূতন আইন প্রবর্ত্তন করিলেন যে, প্রায় সকল রাজকর্ম্মচারীই ভারতবাসীদের ভাগ্যবিধাতা হইয়া উঠিলেন। এই তথা-কথিত বিচারপতিদের হাতে কৃষ্ণকায় মানুষ মাত্রেরই জীবন খেলার সামগ্রী হইয়া পড়িল। শুধু সন্দেহে, বিনা প্রমাণে, সরাসরি বিচার চলিতে লাগিল, এবং একমাত্র দণ্ড হইল ফাঁসি। যা'র যে অপরাধই

হোক্ না কেন, তা'রই দণ্ড ফাঁসি। একজন লোকের কাছে এক থলে' পয়সা পাওয়া যায় বলিয়া তা'র ফাঁসি হয়। "পথপার্শ্বে ও বাজারে যে সকল ব্যক্তিকে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের শব গঙ্গায় ফেলিয়া দিবার নিমিত্ত আটখানি গাড়ী নিয়োজিত হয়। তিন মাস এই গাড়ীতে প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঐ সকল শব লইয়া যাওয়া হয়। সরাসরি বিচারে ছয় হাজার লোকের জীবন এইরূপে বিনষ্ট হইয়াছিল।" —কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সকলেই নির্ভীকভাবে প্রাণ দেয়—একটি লোকও রাজপুরুষদের কাছে জীবন-ভিক্ষা করে নাই।

৬

কানপুরে নানা সাহেব

ঐ তো গেল এলাহাবাদের অবস্থা। কানপুর হইতেও ভয়ঙ্কর সংবাদ আসিতে লাগিল। ৩০শে জুন ৪০০ ইউরোপীয় সৈন্য, ৩০০ শিখ, ১০০ অশ্বারোহী ও ২টি কামান সহ কাপ্তেন রেগুকে কানপুর উদ্ধারের জন্য পাঠানো হয়। কর্ণেল নীল তাঁ'কে লিখিলেন যে, বিদ্রোহীরা যে-সব পল্লীতে বাস করিতেছে পথের দুই ধারের এই রকম সকল পল্লীই ধ্বংস করিতে হইবে এবং পল্লীবাসীদেরও গতাসু করিতে হইবে। ফতেপুরের অধিবাসীরা কোম্পানীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে, সুতরাং তা'দের সকলকেই ফাঁসি দিতে হইবে। ঐ-নগরের পাঠান পল্লী ধ্বংস করিতে হইবে, আর উহার মুসলমান ডেপুটি কালেক্টরের মাথা কাটিয়া নগরের কোন একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের বাড়ীতে টাঙ্গাইয়া রাখিতে হইবে।

এই বীভৎস আদেশ প্রতিপালন করিয়া কানপুরে পৌঁছিবার জন্য রেগু সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। কিছুমাত্র বিচার না করিয়াই তিনি পল্লীবাসীদিগকে বৃক্ষশাখায়

ফাঁসি দিতে লাগিলেন। পথের দুই ধারেই অসংখ্য শব ঝুলিতে লাগিল। পল্লীদাহ, নরহত্যাও অবাধে চলিল।

প্রধান সেনাপতি আন্‌সনের মৃত্যুর পর স্যর পেট্রিক্ গ্রাণ্ট প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি কর্ণেল হ্যাব্‌লক্‌কে এলাহাবাদ হইয়া কানপুর ও লক্ষ্ণৌ যাইতে আদেশ দিলেন।

এই সময়ে কানপুরে দেশীয় সৈনিকের সংখ্যা ছিল তিন হাজার, আর ইউরোপীয় সৈনিক ছিল তিন শত; ইহার মধ্যে ৬৭ জন পদাতিক ও অশ্বারোহী সিপাহীদলে অধিনায়ক ছিলেন। কানপুরের সেনাপতি ছিলেন স্যর হিউ হুইলার।

কানপুরের সিপাহীদের মধ্যে যখন চাঞ্চল্য দেখা গেল তখন ইউরোপীয়গণ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। মিরাট ও দিল্লীর সংবাদেই তাঁ'দের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, এখন তাঁ'রা শুধু বিভীষিকাই দেখিতে লাগিলেন। তাঁ'রা আত্মরক্ষায় প্রস্তুত হইলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁ'রা একটি স্থান নির্দ্দেশ করিলেন। সেনানিবাসেরই কাছাকাছি একটা সমতলক্ষেত্রে শুধু ইউরোপীয় সৈনিকদের দুইটি হাসপাতাল ছিল। এই হাসপাতালই ইউরোপীয়দিগের আত্মরক্ষার স্থানরূপে নির্ব্বাচিত হইল। এই স্থানের চারি

দিকে ৪ ফুটের কিছু বেশী উঁচু একটি বিরাট মাটির প্রাচীর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নির্ম্মিত হইল। তা'র পরই সেনাপতি স্যর হিউ হুইলার সৈন্য পাঠাইবার জন্য লক্ষ্ণৌতে স্যর হেন্‌রী লরেন্সকে অনুরোধ করিলেন। স্যর হেন্‌রী লরেন্সও ২টি কামান ও ৮৪ জন ইউরোপীয় পদাতিক কানপুরে পাঠাইয়া দিলেন।

এ-দিকে সেনাপতি হুইলার বিঠুরের বিখ্যাত নানা সাহেবের কাছেও সাহায্য প্রার্থনা করিলেন ; কারণ, বহু ইংরাজ তাঁ'র গৃহে বহুবার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁ'কে ইংরাজের বন্ধু বলিয়াই জানিয়াছেন। বিঠুরের রাজপ্রাসাদে তাঁ'র ভ্রাতা বালরাও ও বাবাভট্ট এবং তাঁ'র বাল্য-সহচর বিখ্যাত যোদ্ধা তাঁতিয়া তোপিও ছিলেন। এই তাঁতিয়া তোপি ও আজিমউল্লা নামক এক ব্যক্তি নানা সাহেবের মন্ত্রণাদাতা ছিলেন। নানা সাহেব ইংরাজদিগকে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। তাঁ'র উপর ধনাগার রক্ষার ভার দেওয়া হইল। তাঁ'র দুই শত অনুচর ধনাগার রক্ষার উদ্দেশ্যে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া নবাবগঞ্জ নামক স্থানে উপস্থিত হইল।

সেনাপতি আদেশ দিলেন, সকল ইউরোপীয়কে মাটির প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে আত্মরক্ষার জন্য যাইতে হইবে।

এ-দিকে সহরে নানা রকমের ভীষণ জনরব প্রবল হইয়া উঠিল। কাজেই বালক-বালিকা সহ স্ত্রীলোক-পুরুষ সকলেই অতিশয় উৎকণ্ঠিত ও ব্যস্ত হইয়া সেই প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে উপস্থিত হইলেন। মাটির প্রাচীরে বহু কামান স্থাপিত হইল।

সিপাহীদের মধ্যে প্রথমে দ্বিতীয় অশ্বারোহী দলই প্রকাশ্যে বিদ্রোহের পরিচয় দেয়। এই দলের অধিকাংশ সৈনিকই ছিল মুসলমান, ইহারা নিজেদের পরিবারবর্গকে স্থানান্তরে পাঠাইয়া দিয়াছিল। তাড়াতাড়ি মাটির প্রাচীর তুলিয়া, কামান পাতিয়া, ইউরোপীয়দিগকে একই স্থানে সমবেত হইতে দেখিয়া সিপাহীদের সন্দেহ ভয়ানক বাড়িয়া গেল। তা'রা মনে করিল, ইংরাজ তা'দের ধর্ম্ম তো নষ্ট করিয়াছেই, এবার তা'দিগকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিবে। তা'রা অশান্ত হইয়া উঠিল। দ্বিতীয় অশ্বারোহীদলের সুবাদার তা'দিগকে শান্ত রাখিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সিপাহীরা তা'কে তরবারির আঘাতে আহত করিয়া বাহির হইয়া আসিল। পদাতিক দলও তা'দের অনুসরণ করিল এবং নবাবগঞ্জের দিকে ছুটিল। এই নবাবগঞ্জেই ধনাগার, কারাগার ও অস্ত্রাগার ছিল। তা'রা তখন ইউরোপীয়-দিগকে আক্রমণ না করিয়া পথে লুণ্ঠন ও গৃহদাহ করিতে

করিতে ধনাগারের দিকেই অগ্রসর হইল। যে-সমস্ত বিশ্বস্ত সিপাহী ধনাগার রক্ষায় নিযুক্ত ছিল তা'রা ইহাদের আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারিল না। কাজেই উন্মত্ত সিপাহীরা ধনাগার লুণ্ঠন করিল, কারাগারের লৌহ কবাট ভাঙ্গিয়া কয়েদীদিগকে মুক্ত করিল, এবং অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিয়া কামান, বন্দুক ও বারুদ ইত্যাদি দখল করিল, আর কোম্পানীর কাগজ-পত্র সব পোড়াইয়া দিল।

দুই দল সিপাহী সে-পর্য্যন্তও বিদ্রোহে যোগ দেয় নাই, তা'রা তখনও কোম্পানীর অনুরক্ত ছিল। কিন্তু সেনাপতি হুইলার অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হইলেন। সিপাহীরা নিশ্চিন্ত মনে খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত করিতেছে, এমন সময় সেনাপতি তা'দের উপর কামানের গোলা নিক্ষেপ করিতে হুকুম দিলেন। গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। সিপাহীরা খাদ্যদ্রব্য ফেলিয়া ছুটিয়া পলাইতে বাধ্য হইল। তা'রা বাধ্য হইয়া নবাবগঞ্জে গিয়া বিদ্রোহীদের সহিত যোগ দিল।

সিপাহীরা নানা সাহেবকে অনুরোধ করিয়া কহিল, তিনি তা'দের সহিত যোগ দিলে তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তা'রা প্রাণপাত করিবে, আর যোগ না দিলে তাঁকে

জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। নানা সাহেব তা'দের সঙ্গে যোগ দিতে বাধ্য হইলেন। লর্ড ডাল্‌হৌসি তাঁ'র প্রতি যে অবিচার করিয়াছিলেন, তাঁ'কে যে-ভাবে পৈতৃক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন, তা' তখন একে একে তাঁ'র মনে পড়িতে লাগিল। তিনি সিপাহীদের পক্ষাবলম্বনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। সিপাহীরা তাঁ'কে রাজা বলিয়া সম্মান দেখাইল এবং তাঁ'র নামেই সব কাজ করিতে লাগিল। তা'র পর ভিন্ন ভিন্ন দলের অধিনায়ক নির্ব্বাচিত হইলেন।

৬ই জুন, শনিবার, সেনাপতি হুইলার, নানা সাহেবের নামের একখানা চিঠি পাইয়া জানিলেন যে, নানা সাহেব ইউরোপীয়দিগের আত্মরক্ষার স্থান আক্রমণ করিবেন। এইবার প্রাচীরবেষ্টিত স্থান রক্ষা করিবার জন্য কামান সকল গোলাপূর্ণ করা হইল, পদাতিক সকল সঙ্গীনযুক্ত গুলিভরা বন্দুক সহ দণ্ডায়মান হইল, গোলন্দাজেরা প্রাচীরের বাহিরে কামানে আগুন লাগাইবার জন্য প্রস্তুত রহিল। প্রত্যেক সমর্থ ইংরাজকেই অস্ত্রধারণ করিতে হইল।

এই বিদ্রোহ শুধু সিপাহীদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, অধিকারচ্যুত ভূস্বামিগণ ও জনসাধারণ কর্ত্তৃক তা'দের দল-

পুষ্টি হইয়াছিল। সিপাহীদের সহিত ইহাদের মিলনেই ইউরোপীয়দিগের চরম দুর্গতি হয়, প্রাণান্ত ঘটে।

আত্মরক্ষার স্থানে স্ত্রী, শিশু ও কয়েকজন ভারতীয় বিশ্বস্ত ভৃত্য প্রভৃতি লইয়া মোট প্রায় এক হাজার লোক ছিল। ইউরোপীয়দিগকে দিবারাত্র সব সময়েই প্রস্তুত থাকিতে হইত। বিপক্ষের গোলাবর্ষণে একে একে অনেকে অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইল। সিপাহীদলেরও বহু হতাহত হইতে লাগিল। অবলা কুল-কামিনীরাও এ-সময়ে পুরুষদের সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতে ত্রুটি করেন নাই। বিপক্ষের গুলিতে তাঁ'রাও অনেকে দেহত্যাগ করিলেন।

এমনি করিয়া সাত দিন কাটিল। সেনাপতি প্রতি মুহূর্ত্তেই সাহায্যকারী সৈনিকদলের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু এই বিপদের উপর আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। আত্মরক্ষার স্থানের দুইটি বড় বড় গৃহের একটিতে খড়ের চালা ছিল। একদিন অপরাহ্ণে সহসা এই চালা দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। রাত্রিতে অনলশিখা গগনস্পর্শী হইয়া উড়িল। এই গৃহদাহে স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদের আর আশ্রয়-স্থান রহিল না। এখন তাঁ'রা কাপড়, চট্ ইত্যাদি দ্বারা দিনের রৌদ্র হইতে নিজেদের রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই স্থানের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটা প্রকাণ্ড বাড়ী ছিল, সকলে ইহাকে 'সবেদা কুঠি' বলিত। নানা সাহেব এই সময়ে এই কুঠিতেই বাস করিতেছিলেন। তাঁ'র সেনাপতি টিকা সিংহ এইখানেই শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁতিয়া তোপি ও আজিমউল্লা এইখানে থাকিয়াই ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে কূট-মন্ত্রণায় নিযুক্ত ছিলেন। এইখান হইতেই হিন্দু ও মুসলমান একযোগে ইউরোপীয়দের উচ্ছেদ-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল।

অবরুদ্ধ ইউরোপীয়গণ এলাহাবাদ হইতে সাহায্য পাওয়ার জন্য নানা চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হইল,—তবু তাঁ'রা আশা ও উদ্যম ত্যাগ করিলেন না। এ-দিকে খাদ্যদ্রব্য কমিয়া আসিল। বহু ভারতবাসী তাঁ'দের খাদ্য দিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু পারে নাই। নিষেধ সত্ত্বেও যা'রা রাত্রিতে গোপনে খাদ্য বহন করিয়া লইয়া যাইত, তা'রা উন্মত্ত সিপাহীদের কাছে নিষ্কৃতি পাইত না। শেষে অবরুদ্ধ ইউরোপীয়দের অবস্থা এমন হইল যে, একদিন প্রাচীরের পাশ দিয়া একটি ধর্ম্মের ষাঁড় যাইতেছিল, তাঁ'রা সেইটিকে গুলি করিয়া ভিতরে টানিয়া লইলেন। এমন কি প্রাণের দায়ে বুড়া ঘোড়া ও কুকুর পর্য্যন্তও তাঁ'দিগকে আহার্য্যরূপে

গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। জলকষ্ট হইয়াছিল ইহার চেয়েও মারাত্মক। অবরুদ্ধ স্থানে একটিমাত্র কূপ ছিল, তা'রও জল ছিল ৬০।৭০ ফুট নীচে। কেহ জল তুলিতে গেলেই তা'কে বাহির হইতে দেখিতে পাওয়া যাইত, সুতরাং সে আর প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারিত না। এইভাবে অবরুদ্ধ ইউরোপায়দের সকল রকমেই দুর্দ্দশার একশেষ হইতে লাগিল। প্রাচীরের কাছেই একটা প্রকাণ্ড পুরাতন কূপ ছিল। তিন সপ্তাহের মধ্যে অবরুদ্ধ ইউরোপীয়গণ আড়াই শত নিহত ইউরোপীয়কে ঐ কূপে নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হইলেন।

তিন সপ্তাহের পর একদিন একজন ইংরাজ মহিলা পাল্কীতে চড়িয়া, নানা সাহেবের শিবির হইতে একখানা চিঠি লইয়া সেনাপতি হুইলারের কাছে আসিলেন। এই মহিলাটি বন্দিনী হইয়াছিলেন। চিঠিখানা নানা সাহেবের নামে হইলেও আজিমউল্লার লিখিত। ইহাতে ছিল—লর্ড ডাল্‌হৌসির কার্য্যাবলীর সহিত যাঁ'দের কোনরূপ সম্বন্ধ নাই এবং যাঁ'রা অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে সম্মত: আছেন, তাঁ'রা নিরাপদে এলাহাবাদে যাইতে পারিবেন।

—সেনাপতি হুইলার, কাপ্তেন মূর প্রভৃতি স্থির করিলেন, পরামর্শ করিয়া উত্তর দিবেন!

সিপাহীদের আক্রমণ স্থগিত রহিল। পরদিন আজিম-উল্লা ও নানা সাহেবের অশ্বারোহীদলের অধ্যক্ষ জোয়ালা-প্রসাদ আসিলেন। স্থির হইল যে, ইংরাজগণ তাঁ'দের কামান ও টাকা-কড়ি সব পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, তবে তাঁ'দের নিজের নিজের বন্দুক ও যাটবার গুলি নিক্ষেপ করা যায় এই পরিমাণ টোটা সঙ্গে রাখিতে পারিবেন। তাঁ'দের জন্য নৌকা প্রস্তুত থাকিবে এবং তাঁ'দিগকে আহার্য্য দ্রব্যাদিও দেওয়া হইবে। তা'র পরদিন যাওয়া স্থির হইল। সেই দিনই সন্ধ্যার পূর্ব্বে ইংরাজগণ কামান প্রভৃতি বিদ্রোহীদের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

২৭শে জুন প্রত্যূষে ৪৫০ জন ইউরোপীয় বাহির হইলেন, অনেকে কোমরে পিস্তল ও স্কন্ধে বন্দুক লইলেন। স্ত্রীলোক, বালক-বালিকা, রুগ্ন ও আহত ব্যক্তিগণ গরুর গাড়ী, হাতী ও পাল্কী প্রভৃতিতে এলাহাবাদ যাওয়ার জন্য রওনা হইলেন। বৃদ্ধ সেনাপতি হুইলার স্ত্রী ও কন্যাগণের সহিত নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। গঙ্গার তীরে সতীচৌর ঘাটে নৌকা তৈরী ছিল। তখন গঙ্গায় জল খুব কম ছিল, নানা স্থানে চর জাগিয়াছিল। নৌকা একেবারে তীরে আসিতে পারে নাই, কাজেই ইউরোপীয়-গণ হাঁটু জলে নামিয়া নৌকায় উঠিতে লাগিলেন। বেলা

প্রায় ৯টার সময় নৌকায় উঠা শেষ হইল। তাঁতিয়া তোপি, আজিমউল্লা ও টিকা সিংহ অশ্বারোহী সৈনিক ও গোলন্দাজগণ সহ তীরেই ছিলেন।

হঠাৎ ভেরী বাজিয়া উঠিল, আর মাঝিরা নৌকা হইতে লাফাইয়া পড়িল। দুই তীর হইতে নৌকার উপর গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল ; নৌকার ছইগুলি সব জ্বলিয়া উঠিল ; গঙ্গার জল লালে লাল হইয়া গেল। গোলাগুলির শব্দ আর আর্ত্তনাদ মিশিয়া একটা ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি করিল। নানা সাহেব 'সবেদা কুঠি' হইতে টের পাইলেন যে, সতীচৌর ঘাটে এই লোমহর্ষণ কাণ্ড হইতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ হত্যাকাণ্ড বন্ধ করিতে আদেশ দিলেন। তাঁ'র আদেশে হত্যাকাণ্ড বন্ধ হইল এবং হতাবশিষ্ট সর্ব্বসমেত প্রায় ১২৫ জন অবরুদ্ধ হইল।

একখানা নৌকা বাঁচিয়া গিয়াছিল ; ইহাতে আগুন লাগে নাই। এই নৌকাতেই কাপ্তেন টম্‌সন ও মূর প্রভৃতি ছিলেন। কাপ্তেন মূর এবং আরোহীদের কেহ কেহ নিহত হইলেন। যাঁ'রা নিহত ও আহত হইলেন তাঁ'রা নৌকার তলায় পড়িয়া রহিলেন। হাল কিংবা দাঁড় কিছুই ছিল না বলিয়া স্রোতে নৌকা ভাসিয়া চলিল। খাদ্যদ্রব্যের অভাবে এই ইংরাজগণ গঙ্গোদক

পান করিয়া জীবন ধারণ করিলেন। দ্বিতীয় দিন রাত্রিতে যখন তাঁ'রা ক্ষুৎ-পিপাসায় অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন, তখন নৌকা তীরে লাগিল। কাপ্তেন টম্‌সন ১৪ জন সৈনিক সহচর সহ তীরে লাফাইয়া পড়িলেন। এ-দিকে নৌকা স্রোতে ভাসিয়া গেল। সেখানকার বহু সশস্ত্র লোক তাঁ'দিগকে আক্রমণ করিল। তাঁ'রা উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে দৌড়াইতে তিন মাইল দূরে গিয়া একটি মন্দির দেখিতে পাইলেন। সেই মন্দিরে আশ্রয় লইয়া এবং মন্দিরের শীতল জল পান করিয়া একটু সুস্থ হইলেন। তাঁ'দের চারিজন বন্দুক ও সঙ্গীন লইয়া মন্দিরের দ্বার রক্ষা করিতে লাগিলেন। আক্রমণ-কারিগণ শুষ্ক কাষ্ঠ একত্র করিয়া মন্দিরের সাম্‌নে আগুন ধরাইয়া দিল। জানালাশূন্য সেই ক্ষুদ্র মন্দিরে সাধারণ অবস্থায়ও ১৪ জনের থাকাই অত্যন্ত কষ্টকর, তা'র উপর প্রচণ্ড উত্তপ্ত ধূমরাশি, কাজেই অবরুদ্ধ ইংরাজগণ হঠাৎ বাহির হইয়া নদীতীরের দিকে ছুটিতে লাগিলেন। তীরে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ৭ জন এবং তীরে পৌঁছিয়া আরও ৩ জন বিপক্ষের গুলিতে প্রাণ দিলেন। অবশিষ্ট চারিজন বন্দুক ফেলিয়া গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তাঁ'রা যখন নিতান্ত অবসন্ন

অবস্থায় ভাসিয়া যাইতেছিলেন তখন কয়েকজন লোক তাঁ'দিগকে তুলিয়া মেরারমৌ নামক স্থানের রাজা দিগ্বিজয় সিংহের কাছে লইয়া গেল। দিগ্বিজয় সিংহ কোম্পানীর খুব অনুরক্ত ও অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। তাঁ'র আশ্রয়ে প্রায় ৩ মাস থাকিয়া তাঁ'রা সেনাপতি হ্যাব্‌লকের সৈন্যদলের সহিত নিরাপদে মিলিত হ'ন।

যে নৌকা হইতে তাঁ'রা তীরে নামিয়াছিলেন সেই নৌকায় সবশুদ্ধ ৮০ জন আরোহী ছিলেন। তাঁ'রা বন্দী হইয়া কানপুরে নীত হইলেন। পুরুষদিগের প্রাণদণ্ড হইল এবং মহিলা ও বালক-বালিকা-দিগকে 'সবেদা কুঠি'তে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইল। সতীচৌর ঘাট হইতে যাঁ'দিগকে আনিয়া বন্দীভাবে রাখা হইয়াছিল, ইঁহারাও তাঁ'দের দলেই রহিলেন।

১লা জুলাই নানা সাহেব 'পেশোয়া' বলিয়া ঘোষিত হইলেন। সমস্ত কানপুর সন্ধ্যা হইতে আলোকমালায় ঝল্‌মল্ করিতে লাগিল। কিন্তু তাঁ'র নিজের কর্ত্তৃত্ব বিশেষ-কিছুই ছিল না, আজিমউল্লা যে পরামর্শ দিতেন তিনি তা'ই গ্রহণ করিতেন।

এবার সেনাপতি হ্যাব্‌লক্ সসৈন্যে কানপুরে আসিতেছেন জানিয়া নানা সাহেব তাঁ'র আক্রমণ প্রতি-

হত করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। 'সবেদা কুঠি' হইতে অবরুদ্ধ স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদিগকে বিবিঘর নামক একটি বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হইল। ইঁহাদের সংখ্যা প্রায় দুই শতের কাছাকাছি। এ-দিকে ফতেপুর হইতে অনেক ইংরাজই প্রাণরক্ষা করিবার জন্য কানপুরের দিকে আসিতেছিলেন। নবাবগঞ্জের নিকটে তাঁ'রা বন্দী হইলেন। তাঁ'দিগকেও কানপুরে আনা হইল। পুরুষেরা কেহই নিষ্কৃতি পাইলেন না। স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদের বিবিঘরে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইল। ক্ষুদ্র বাড়ীতে এত লোক থাকিবার ফলে অনেকেরই অতিসারে প্রাণ গেল।

সেনাপতি হ্যাব্‌লক্ ৭ই জুলাই এলাহাবাদ হইতে অভিযান করিলেন। সেনানায়ক রেণ্ড পূর্ব্বেই সেনাপতি নীলের আদেশে সসৈন্যে কানপুরের দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন। ১১ই জুলাই সেনাপতি হ্যাব্‌লকের সহিত রেণ্ডের সাক্ষাৎ হইল। দুইজনের সৈন্য মিলিত হইয়া ১৪০০ ইউরোপীয় সৈন্য, ৬০০ দেশীয় সহকারী সেন্য এবং ৮টি কামান হইল।

এ-দিকে ইংরাজ সৈন্যকে বাধা দিবার জন্য সেনাপতি জোয়ালাপ্রসাদ ও টিকা সিংহ ১৫০০ পদাতিক ও গোলন্দাজ,

৫০০ অশ্বারোহী এবং ১৫০০ সশস্ত্র সাধারণ লোক সহ এলাহাবাদ যাত্রা করিলেন। তাঁ'দের সহিত ১২টি কামানও ছিল। নানা সাহেবের এই সৈন্যদল ফতেপুরে শিবির স্থাপন করিল। ১২ই জুলাই সেনাপতি হ্যাব্‌লকের সৈন্যদল জোয়ালাপ্রসাদের সম্মুখীন হইল। এই বিখ্যাত যুদ্ধে জোয়ালাপ্রসাদের অশ্বারোহীদল অসাধারণ বীরত্ব ও রণনৈপুণ্য দেখাইল। ইংরাজের অশ্বারোহীদল ইহাদের তেজে হটিয়া গেল। কিন্তু ইংরাজের কামান ও বন্দুকের পাল্লা বেশী ছিল বলিয়া, সেনাপতি হ্যাব্‌লক্‌ই শেষে এই ফতেপুরের যুদ্ধে জয় লাভ করিলেন। সিপাহীরা কামানগুলি ফেলিয়া পলায়ন করিল।

ইংরাজের এই জয়ের পূর্ব্বে ফতেপুর পাঁচ সপ্তাহ কাল নানা সাহেবের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। এখানেও উত্তেজিত সিপাহীরা কয়েদীদিগকে মুক্ত করে, ধনাগার লুণ্ঠন ও কাছারীগৃহ অগ্নিসাৎ করে। এখানকার ১০ জন ইউরোপীয়ের মধ্যে ৯ জন পলায়ন করেন, কেবল এক জন ইংরাজ বিচারপতি কিছুতেই স্থানত্যাগ করিলেন না। সিপাহীদের হাতে তাঁ'কে প্রাণ দিতে হইল।—এই বার ইংরাজ ও শিখ সৈন্য ফতেপুর লুণ্ঠন ও গৃহে গৃহে অগ্নিসংযোগ করিতে

লাগিল এবং তোপদ্বারা বহু বৃহৎ অট্টালিকা ধ্বংস করিল।

এই সময় বালরাও সসৈন্যে ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া আওঙ্গনামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। সেনাপতি হ্যাব্‌লকের সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধ বাধিল। কানপুরের সৈন্য, বিশেষতঃ অশ্বারোহীদল, এবারেও রণনৈপুণ্য ও পরাক্রমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল, কিন্তু ইংরাজের উন্নত ধরণের কামান ও বন্দুকের অগ্নিবর্ষণে কিছুই করিতে পারিল না। ইহা সত্ত্বেও বাল-রাওয়ের সৈন্যদল অপূর্ব্ব কৌশলে বিপক্ষকে পশ্চাদ্দিক হইতে আক্রমণ করিল, কিন্তু দুই ঘণ্টা নিদারুণ যুদ্ধের পর তা'রাও পরাজিত হইল। সেনানায়ক রেণ্ড নিহত হইলেন, আর বালরাও আহত হইয়া কানপুরে ফিরিলেন।

তখন কানপুরেই হ্যাব্‌লকের সৈন্যদলকে বাধা দেওয়া পরামর্শসিদ্ধ হইল। ইতিমধ্যে আজিমউল্লার কুমন্ত্রণায় অবরুদ্ধ রমণী ও বালক-বালিকাদিগকে হত্যা করা স্থির হইল। নানা সাহেব এই হত্যাকাণ্ডের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু আজিমউল্লাই সর্ব্বেসর্ব্বা, তিনি নিরস্ত হইলেন না; প্রায় দুই শত অবরুদ্ধ মহিলা ও বালক-বালিকাকে নির্ম্মম, নৃশংসভাবে বিবিঘরে হত্যা করা হইল।

নানা সাহেব প্রায় ৫০০০ সৈন্য লইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং কানপুর হইতে চারি মাইল দুরে সৈন্য সমাবেশ করিলেন। যে-স্থানে তিনি ব্যূহ রচনা করিলেন সেই স্থান দিয়াই ইউরোপীয় সৈন্যের কানপুরে আসিবার পথ। বহুদর্শী রণনিপুণ সেনাপতি হ্যাব্‌লক্ সৈন্য-সমাবেশে নানা সাহেবের নিপুণতা দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। তাঁ'র ১০০০ ইউরোপীয় ও ৩০০ শিখ সৈন্য ছিল। ১৬ই জুলাই এই বিখ্যাত যুদ্ধ ঘটে। ইংরাজ সেনাপতি সমস্ত সৈন্যদল সহ বিপক্ষকে হঠাৎ আক্রমণ করিতে সাহস করিলেন না। যদি তিনি সব সৈন্য লইয়া একবারে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করিতেন তা' হইলে তাঁ'র নিশ্চিত পরাজয় ঘটিত। তিনি খুব কৌশলের সহিত সৈন্য সন্নিবেশ করিলেন। কানপুরের সিপাহীরা গোলা-বৃষ্টি করিতে লাগিল, ইংরাজ সৈন্য কোনক্রমেই তা'দের তোপ বন্ধ করিতে পারিল না। শেষে সেনাপতির আদেশে পদাতিক দল গুলিবৃষ্টি করিতে করিতে যখন শত্রুপক্ষের খুব নিকটবর্ত্তী হইল, তখন সঙ্গীন দিয়া আক্রমণ করিয়া সিপাহীদের কামান দখল করিল। কানপুরের অশ্বারোহী-দল ইংরাজ সৈন্যবাহিনীকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ঘিরিয়া ফেলিল, কিন্তু উপযুক্ত চালকের অভাবে তা'রা নিজেরা বিচ্ছিন্ন

হইয়া পড়িল। আড়াই ঘণ্টা যুদ্ধের পর জয়ের আশা ত্যাগ করিয়া নানা সাহেব যুদ্ধস্থান ত্যাগ করেন। তা'র পর তিনি বিঠুরের প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া গঙ্গা পার হইয়া সকলের অলক্ষিতে পলায়ন করিলেন।

১৭ই জুলাই সেনাপতি হ্যাব্‌লক্ কানপুর অধিকার করিতে যাত্রা করেন। ঐ-দিনই কানপুরে আবার বৃটিশের প্রাধান্য স্থাপিত হইল, আবার বৃটিশের বিজয়পতাকা উড়িল।

বিদ্রোহী সিপাহীরা নানাদিকে পলায়ন করিয়াছিল। সহরে ইংরাজের শত্রু না থাকা সত্ত্বেও কানপুরে স্বজাতীয়-গণের হত্যাকাণ্ড শ্রবণে উন্মত্ত ও প্রতিহিংসাপরায়ণ ইউরোপীয় সৈনিকগণ স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে যে-কোন অধিবাসীকে দেখিতে পাইল তা'কেই হত্যা করিল। এমনি করিয়া প্রায় দশ হাজার অধিবাসীকে তা'রা হত্যা করে। তা' ছাড়া, মদিরা-বিভোর গোরা সৈন্য চতুর্দ্দিকে অবাধে অবিচ্ছিন্ন-ভাবে লুণ্ঠন করিতে থাকে। তা'রা বিঠুরে গিয়া নানা সাহেবের প্রাসাদ বিধ্বস্ত এবং তাঁ'র সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন করিল।

ইহার পর হ্যাব্‌লক্ লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিলে সেনাপতি নীল কানপুরে তাঁ'র কার্য্যভার গ্রহণ করেন। সেনাপতি

নীল শুধু বিনাবিচারে যাকে-তাকে ফাঁসি দিয়াই ক্ষান্ত হ'ন নাই। ফাঁসির পূর্ব্বে হতভাগ্যগণকে বিবিঘরের এক এক অংশের রক্ত পরিষ্কার করিতে আদেশ দেওয়া হইত। কেহ তাহা করিতে অস্বীকার করিলেই জাতি-বর্ণ, উচ্চনীচ নির্ব্বিশেষে তা'কে পুনঃ পুনঃ কশাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া, তা'র দ্বারা সেই রক্ত পরিষ্কার করাইয়া, তা'কে ফাঁসি দেওয়া হইত। একদিন দেওয়ানী আদালতের একজন মুসলমান কর্ম্মচারীকে জিহ্বাদ্বারা চাটিয়া রক্ত পরিষ্কার করিতে আদেশ দেওয়া হইল। তিনি আপত্তি করিলেন; কিন্তু শেষে কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া তা'ই করিতে হইল। তা'র পর তাঁ'র ফাঁসি হইল। এমনি করিয়া বিদ্রোহীদিগকে ভীতি-প্রদর্শন চলিতে লাগিল।

কানপুরে বিদ্রোহের যবনিকা পতন হইল।

৭

পঞ্চনদে

লাহোর হইতে ছয় মাইল দূরে মিয়াঁমিরের সেনা-নিবাসে তিন দল দেশীয় পদাতিক, এক দল অশ্বারোহী, কয়েকজন কামানরক্ষক এবং একদল ইউরোপীয় পদাতিক সৈন্য ছিল।

এ-দিকে মিরাটের সংবাদে লাহোরও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। মিরাটে বহু ইউরোপীয় নিহত হইয়াছেন, অনেকে প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিয়াছেন। দিল্লীর সংবাদও অতি ভয়ানক।

যদিও লাহোর ও মিয়াঁমিরের সিপাহীদের বিদ্রোহের বা ষড়যন্ত্রের বিশেষ কোন প্রমাণই পাওয়া যায় নাই, তথাপি কর্ত্তৃপক্ষ তা'দিগকে নিরস্ত্র করাই স্থির করিলেন। তখন পাঞ্জাবের প্রধান কমিশনার ছিলেন স্যর জন লরেন্স।

১৩ই মে তারিখে প্রাতঃকালে সমস্ত সিপাহীদলকে কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হওয়ার আদেশ দেওয়া হইল। ইউরোপীয় সৈনিকদল অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া পূর্ব্ব হইতেই দণ্ডায়মান ছিল, আর সিপাহীদের

পশ্চাদ্দিকে বারুদপূর্ণ করিয়া কতকগুলি কামান সাজাইয়া রাখা হইল। সিপাহীরা পুর্ব্বে কিছুই জানিতে পারে নাই। কাওয়াজের ক্ষেত্রে তা'দিগকে অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিয়া এক জায়গায় রাখিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইল। সাজসজ্জা ও আয়োজন দেখিয়া তা'রা সবই বুঝিতে পারিল, কাজেই বিনা আপত্তিতে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিল। এইরূপে সেদিন মাত্র ৬০০ ইউরোপীয় সৈনিকের সাহায্যে ২৫০০ সিপাহীকে নিরস্ত্র করা হইল।

অমৃতসরের গোবিন্দগড় দুর্গের সিপাহীদের উপরও কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ সন্দেহ জন্মিয়াছিল, কারণ এখানে দেশীয় সৈন্যই বেশী ছিল। কাজেই তাঁ'রা ইউরোপীয় সৈন্য আনাইয়া সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিয়া অমৃতসর রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন।

ফিরোজপুর ও ফিলোরে গোলাগুলি ইত্যাদি মারণাস্ত্রের উপকরণ খুব বেশী পরিমাণেই ছিল। এ-দিকে মিরাট ও দিল্লীর সংবাদে সিপাহীরাও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং এই উত্তেজনা জনসাধারণের মধ্যেও প্রসার লাভ করিয়াছিল। সিপাহীদের মধ্যে বিপ্লবের নিদর্শনে ইউরোপীয়গণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। ইউরোপীয় সৈন্যগণ ফিরোজপুরের অস্ত্রাগার রক্ষার ব্যবস্থা

করিল বটে, কিন্তু সৈনিকনিবাসের বিশৃঙ্খলা ও জনসাধারণের উত্তেজনা কমাইতে পারিল না। জনসাধারণ উত্তেজিত হইয়া ইউরোপীয় 'অফিসার'দের ভোজনগৃহ, উপাসনা-গৃহ, বাঙ্গলো ইত্যাদি লুঠ করিল এবং অগ্নি-সংযোগে ভস্মীভূত করিয়া দিল ; কিন্তু এই উত্তেজনার বশেও কি সিপাহীর দল, কি জনসাধারণ, কেহই ইউরোপীয় 'অফিসার'দের পরিবারবর্গের কোন অনিষ্ট করে নাই, তাঁ'রা সেনানিবাসে নিরাপদেই ছিলেন। একদল সিপাহীকে নিরস্ত্র করা হইল, কিন্তু আর একদল কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করিল। তখন বারুদ-খানায় আগুন লাগাইয়া গোলাগুলি সব ধ্বংস করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত হইলেন। উত্তেজিত সিপাহীর দল দিল্লীর দিকে ছুটিল। একদল ইউরোপীয় সৈন্য তা'দের অনুসরণ করিল, কতক ধরা পড়িয়া প্রাণ দিল, অনেকে নানা পল্লী ও জঙ্গলে আশ্রয় লইল, অনেকে দিল্লীতে গিয়াও পেঁাছিল।

ফিলোরেও ইউরোপীয়গণ প্রতিমুহূর্ত্তেই বিদ্রোহের বিভীষিকায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, কাজেই তাঁ'রা দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষার সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করিলেন। কিন্তু সৈনিকনিবাসে কোনরূপ অশান্তির

উদ্ভব হয় নাই। সেই সময়ে জলন্ধরের সেনানিবাসের কাছে আরও অনেকগুলি সেনানিবাস ছিল। এই সকল স্থানেও বিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী মনে করিয়া ইউরোপীয়গণ কর্পূরতলার মহারাজা রণধীর সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। যদিও কোম্পানী কর্পূরতলা রাজ্যের কিয়দংশ গ্রাস করিয়াছিলেন, তবু রণধীর সিংহ ৫০০ সৈন্য ও ২টি কামান দিয়া ইউরোপীয়দের সাহায্য করিলেন। এই মহাসঙ্কটকালে দেশীয় ভূপতিগণ সর্ব্বস্ব দিয়াও তাঁ'দের সাহায্য করিতে ত্রুটি করেন নাই।

উত্তরপশ্চিম সীমান্তে পেশোয়ার বিভাগে ২৫০০ ইউরোপীয় এবং ১০,০০০ ভারতীয় সিপাহী ছিল। কর্ণেল নিকল্‌সন এবং মেজর এড্‌ওয়ার্ডিস্‌ এই বিভাগের শাসন-কার্য্য চালাইতেছিলেন। এখন মিরাট ও দিল্লীর সংবাদে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া তাঁ'রা নানারূপ পরামর্শ আরম্ভ করিলেন। বয়োবৃদ্ধ সেনাপতি রিড্‌কেই এই বিভাগের প্রধান সেনাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইল এবং ইউরোপীয়দিগকে রক্ষা করিবার জন্য একটি অস্থায়ী সৈনিকদল গঠিত হইল। প্রধান কমিশনার স্যর জন লরেন্স আফগান ও শিখদের লইয়া একটি নূতন সৈন্যদল গঠন করেন। পুলিশের শক্তিও অত্যন্ত

বৃদ্ধি করা হইল। ইহা ছাড়া "দেওয়ানী বিভাগের প্রত্যেক কর্ম্মচারী, যাহাকে গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন, তাহাকেই ফাঁসীকাষ্ঠে বিলম্বিত করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েন। এইরূপে এলাহাবাদের ন্যায় পঞ্জাবেও ভীষণ যমদণ্ড পরিচালনার ব্যবস্থা হয়।"

নিকল্‌সন ও এড্‌ওয়ার্ডিস্ পেশোয়ারের ৫ দল সিপাহীর মধ্যে ৪ দলকেই অবিলম্বে নিরস্ত্র করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহের কোন লক্ষণই দেখা যায় নাই, অথচ তা'দিগকে কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত করাইয়া, চারিদিকে বারুদ-ভরা কামান সাজাইয়া, সব রকম আট-ঘাট বাঁধিয়া নিরস্ত্র করা হইল। এই অবস্থায় সিপাহীদের মধ্যে নানা রকমের সন্দেহ ও আতঙ্ক জন্মিল, কাজেই অত্যন্ত বিচলিত হইয়া অনেকে সেখান হইতে পলায়ন করিল। কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া সৈনিকনিবাস পরিত্যাগ করিবার অপরাধে তা'দের ধরিবার চেষ্টা করা হইল। অনেকে ধরা পড়িল, অনেকের ফাঁসি হইল, অনেকের অন্য নানা রকমের কঠোর দণ্ড হইল।

তখন নওশেরায় একদল সিপাহী অবস্থান করিতে-ছিল। কর্ত্তৃপক্ষ এই সিপাহীদলকে নিরস্ত্র করিতে কৃতসঙ্কল্প

হইলেন। সিপাহীরা এত বিশ্বস্ত ছিল যে, তা'দের ইংরাজ 'অফিসার'গণ পর্য্যন্ত ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। পেশোয়ার হইতে বহু ইউরোপীয় সৈন্য সেখানে লইয়া যাওয়া হইল। ইহাতে সিপাহীরা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। ১২০ জন ছাড়া বাকী সব সিপাহী গোলাগুলি লইয়া নানাস্থানে পলায়ন করিল। তা'দের পিছন পিছন একদল অনুসন্ধানকারী সৈন্যও ছুটিল, তা'দের গুলিতে দুর্গম পার্ব্বত্য পথে প্রায় ১২০ জন পলাতক সিপাহী প্রাণত্যাগ করিল, প্রায় ১৫০ জন বন্দী হইল, আর তিন-চারি শত আহত হইল। ইহা সত্ত্বেও তা'রা খুব বীরত্বের সহিত অনুসন্ধানকারী সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করিল। পলায়িত সিপাহীরা খাদ্যাভাবে, বৃষ্টিতে, হিমে অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। কোনখানেই তা'রা একটু আশ্রয় পায় নাই। তা'দের কতকের ফাঁসি হইল, আর কতকের কামানের মুখে প্রাণ গেল। যা'রা পূর্ব্বে বন্দী হইয়াছিল তা'দের এক-তৃতীয়াংশকে কামানের গোলায় উড়াইয়া দিয়া, বাকী সকলের প্রতি অতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হইল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জলন্ধর দুর্গের সিপাহীদের উপর কর্ত্তৃপক্ষের সন্দেহ হয়। ৭ই জুন হঠাৎ ইউরোপীয় সৈনিকদলের অধিনায়কের গৃহে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। রাত্রিকালে চারিদিকে ভৈরব কোলাহলে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত হইল। ইউরোপীয়গণ বিশেষ ভীত হইলেন এবং মহিলাগণ শিশুদিগকে লইয়া নিরাপদ স্থানে যাইবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু সিপাহিগণ ভয়ানক কাণ্ড কিছুই করিল না। তা'রা ইংরাজদিগকে অবিশ্বাস করিয়াছিল, তাই জলন্ধরের সৈনিকনিবাস ছাড়িয়া চলিয়া গেল। লেফ্‌টেন্যাণ্ট্‌ উইলিয়াম্‌স্‌ একদল শিখ-সৈন্য লইয়া তা'দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। অনেক দূরে গিয়া শতদ্রুর তীরে সিপাহীদের সহিত তাঁ'র সাক্ষাৎ হইল। তখন সম্মুখ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে ইংরাজকে রক্ষা করিবার জন্য শিখ্‌ সৈন্য স্বদেশীয়দের বিরুদ্ধে প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিল। কিন্তু ইংরাজ ও শিখ সৈন্যকেও শেষে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। এ-দিকে বিজয়ী বিদ্রোহী সিপাহীদল অগ্রসর হইয়া লুধিয়ানায় প্রবেশ করিল। লুধিয়ানা দুর্গের সিপাহীরা তা'দের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ তো করিলই, জনসাধারণও তা'দিগকে উৎসাহিত ও সহায়তা করিতে লাগিল। কাজেই

কারাগারের কয়েদীরা মুক্তিলাভ করিল, ইউরোপীয়দের গৃহে গৃহে লুটপাট আরম্ভ হইল। সিপাহীরা ইহার পর আর কিছু না করিয়া রাত্রিকালেই দিল্লীর দিকে যাত্রা করিল।

সিপাহীরা তো চলিয়া গেল। এবার ইংরাজ সৈন্য লুধিয়ানায় আসিয়া জনসাধারণের উপর যমদণ্ডের ব্যবস্থা করিতে লাগিল। এক এক দলকে ধরিয়া আনা হইল, আর বিচারকগণ তখন তখনই দণ্ডাদেশ দিতে লাগিলেন। অন্যান্য স্থানের মত এখানেও কথায় কথায় ফাঁসি আরম্ভ হইল। রাজপুরুষগণ ঘোষণা করিলেন যে, যা'র কাছে যুদ্ধের উপযোগী অস্ত্র পাওয়া যাইবে তা'কেই কঠিন দণ্ড দেওয়া হইবে।

চারিদিকে এমনি করিয়া ইংরাজগণ যখন বিদ্রোহের ঘূর্ণাবর্ত্তে বিপন্ন, তখন ঝিন্দ্, নাভা, পাতিয়ালার রাজারা তাঁ'দিগকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়া রাজ-ভক্তির পরিচয় দেন।

এ-দিকে কাপ্তেন ডেলি নামক একজন ইংরাজ সেনা-নায়ক দিল্লী উদ্ধারের জন্য পেশোয়ার হইতে একদল সৈন্য লইয়া, লুধিয়ানা ও অম্বালার পথে যাত্রা করেন। পথে সন্দেহক্রমে তিনি অনেক পল্লী আক্রমণ করেন।

অনেকে প্রাণভয়ে পলায়ন করিল, বহু লোক আহত ও বন্দী হইল, তা'দের বাড়ীঘর ভস্মীভূত হইল, অনেকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়া ভব-যন্ত্রণার হাত হইতে রক্ষা পাইল, বন্দুকের গুলিতেও অনেকে প্রাণ দিল। এইরূপে বীরত্ব প্রকাশ করিতে করিতে ডেলি সসৈন্যে দিল্লীতে গিয়া পোঁছিলেন।

৮

দিল্লী-উদ্ধার

১৯শে জুন, সবেমাত্র সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে, এমন সময় দিল্লীর একদল সিপাহী ইংরাজ-দিগকে আক্রমণ করিল। তা'র পর ক্রমে ক্রমে যখন জগৎ গাঢ় মসীলিপ্ত হইয়া গেল, তখন সিপাহীরা ফিরিয়া গেল। ইংরাজ-পক্ষের ২০জন হত এবং ৭৭জন আহত হইল। পাঞ্জাব সৈন্যদলের কাপ্তেন ডেলি আহত হইলেন।

দিল্লীর পুরাতন সেনানিবাসের সংলগ্ন প্রায় ২ মাইল প্রশস্ত ও প্রায় পঞ্চাশ-ষাট ফিট্ উচ্চ এক পাহাড়ের সন্নিকটে সরকারের পেন্সনভোগী শ্রীজী রাওয়ের বিরাট বাসভবন ছিল। লোকে ইহাকে হিন্দু রাওয়ের বাড়ী বলিত। পাহাড়ের উপর গোলঘর বা 'ফ্লাগ্ ষ্টাফ্ টাওয়ার্' ছিল। গোলঘর ও হিন্দু রাওয়ের বাড়ী প্রভৃতি ইংরাজদের আশ্রয়-স্থান হয়। এই সকল স্থানে ও দিল্লীর বিখ্যাত মানমন্দিরে ইংরাজগণ সৈন্য সন্নিবেশ ও কামান স্থাপন করেন।

২২শে জুন পাঞ্জাব হইতে ৮৫০জন সৈনিক ও ৫টি

কামান আসিল। ইংরাজদের হতাশ প্রাণে আবার আশার সঞ্চার হইল। এ-দিকে দিল্লীতেও পাঞ্জাবের নানাস্থানের বিদ্রোহী সিপাহীর দল আসিয়াছিল।

২০শে জুন ঊষার সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লীর লাহোর তোরণ দিয়া একদল সিপাহী বাহির হইল। ইংরাজেরা পূর্ব্ব হইতেই সকল রকমের সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, কাজেই সিপাহীরা ইংরাজ শিবিরের শুধু দক্ষিণ ভাগ আক্রমণ করিতে পারিল। সমস্ত দিন ধরিয়া তুমুল যুদ্ধ চলিল। পাঞ্জাব হইতে নূতন সৈন্যদল আসায় ইংরাজ-পক্ষের শক্তি বৃদ্ধি হইল। সন্ধ্যার সময় সিপাহীরা নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। ইংরাজগণ সবজীমন্দির অধিকার করিলেন।

৫ই জুলাই সেনাপতি বার্ণার্ড দেহত্যাগ করিলেন, তাঁ'র স্থানে সেনাপতি রিড কাজ করিতে লাগিলেন। এক মাস কাটিয়া গেল। সেনাপতি রিড সসৈন্যে দিল্লীর নিকট রহিলেন বটে, কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না। অনেকে নিহত হইল, আহত হইল, অনেকের নানাবিধ ব্যাধি হইতে লাগিল। অবস্থা খারাপ বুঝিয়া রিড পদত্যাগ করিলেন। তখন উইলসন ইংরাজ শিবিরের অধ্যক্ষ হইলেন। সিপাহীরা তাঁ'দিগকে পুনঃ পুনঃ

আক্রমণ করিতে লাগিল। ইংরাজ সৈন্যদিগকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে ২০ বারের অধিক যুদ্ধ করিতে হয়; তা'দের নিদ্রা ছিল না, বিশ্রাম ছিল না, সর্ব্বদাই সিপাহীদের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইত।

ইংরাজগণের এই শোচনীয় অবস্থার সময়ে অনেক ভারতবাসী তাঁ'দিগকে সাহায্য করে। খাল্‌সা শিখ বিদ্রোহী স্বদেশবাসিগণের বিরুদ্ধে ইংরাজ-পক্ষে দণ্ডায়মান হয় ও অপূর্ব্ব বীরত্বের পরিচয় দেয়। এই সময়ে ইংরাজ শিবিরে এক একজন ইংরাজকে সাহায্য করিবার জন্য দশ জন করিয়া ভারতবাসী নিযুক্ত ছিল। দিল্লী উদ্ধার করিবার জন্য পাঞ্জাবের নানাস্থান ও পাঞ্জাবের বাহিরের অন্যান্য স্থান হইতেও বহু সৈন্য দিল্লীতে পাঠানো হইল। যুদ্ধের উপযোগী অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্য ও অন্য সকল রকম উপকরণ প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইল। এই সব ব্যাপারে চারি মাস কাটিয়া গেল বটে, কিন্তু যথেষ্ট বল সঞ্চয় করিয়া দিল্লী অবরোধ করাই ইংরাজ বিশেষজ্ঞদের সঙ্কল্প ছিল।

সেপ্‌টেম্বর মাসের প্রথম ভাগে ইংরাজ সৈন্য দিল্লী অবরোধ করে। সেনাপতি ছিলেন উইলসন, সৈন্যসংখ্যা

৬৫০০, ইহার মধ্যে ইউরোপীয় ছিল ১২০০ মাত্র। ৭ই সেপ্‌টেম্বর রাত্রিতে সেনাপতির নির্দ্দেশানুসারে দিল্লীর সমস্ত ফটকের দিকে কামান স্থাপন করা হইল। গরুর গাড়ীতে করিয়া গোলাবারুদ সব নেওয়া হইল, ইহাতে গোলমালও যথেষ্ট হইল। কিন্তু দিল্লী নগরীর সিপাহীর দল এই গোলযোগের কারণ বুঝিতে পারিল না, তা'রা নিশ্চেষ্ট হইয়াই রহিল। তা'র পর কামান হইতে অনর্গল অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ হইল। দিল্লীর বিখ্যাত প্রাচীর দুই জায়গায় ভাঙ্গিয়া গেল। সেই ভগ্ন স্থান দিয়া ইংরাজ সৈন্য অতি কৌশলের সহিত অভিযান করিল। অত্যন্ত দক্ষতা সহকারে ও বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ইংরাজ-পক্ষ হইতে যুদ্ধ পরিচালিত হইতে লাগিল। সিপাহীদের পরিচালক বখত্‌ খাঁ খুব রণনিপুণ ছিলেন বটে, কিন্তু বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তিনি সব জায়গায় শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে পারিলেন না।

প্রত্যেক ইংরাজ সৈন্যদলকে সাহায্য করিবার জন্য শিখ, সিপাহী ও গুর্খা সৈন্যও ছিল। সেনানায়ক নিকলসন দুর্জ্জয় সাহসের পরিচয় দিয়া কাশ্মীর গেটের নিকটবর্ত্তী 'মেইন গার্ড' অধিকার করিলেন। আর একদল ইংরাজ সন্য বহু যোদ্ধার প্রাণপাত করিয়া কাবুল গেট অধিকার

করিল। প্রায় দুই সপ্তাহ অনবরত যুদ্ধের পর ইংরাজ-পক্ষের পরাজয় হইল। সিপাহীরা বীরত্বের একশেষ দেখাইল বটে, কিন্তু যুদ্ধের সময় দিল্লীর বাহির হইতে তা'দিগকে ক্রমাগত সাহায্য করিবার মত কোন বড় শক্তি না থাকায় তা'রা দেশবাসী ও ইউরোপীয়দের একযোগে আক্রমণের বেগ প্রতিহত করিতে পারিল না।

দিল্লীর কিয়দংশ অধিকার করিয়াই ইংরাজ-পক্ষের সৈন্যেরা দোকানপাট ইত্যাদি লুঠ করিতে লাগিল। তা'রা মদ্যপানে এত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িল যে, সেনাপতি উইলসন সমস্ত মদ নষ্ট করিয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন। হাজার হাজার মদের বোতল ভাঙিয়া ফেলা হইল, রাস্তায় মদের স্রোত বহিল। সিপাহীরা ইংরাজ সৈন্যের এই শৃঙ্খলাহীনতার সুযোগ নিতে পারিলে অনায়াসেই ইংরাজ-পক্ষের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারিত, এমন কি দিল্লীতে তা'দেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইত। দিল্লীর কতকাংশ ইংরাজ সৈন্য অধিকার করিলেও, ইংরাজ সৈন্যেরই আর একটা দল কৃষ্ণগঞ্জে সিপাহীদের কাছে পরাজিত হয়। শেষে মোগল বাদশাহের প্রাসাদে 'ইউনিয়ন্ জ্যাক্' সদম্ভে উড়িল। তা'র পর শিখ সৈন্য অবাধ লুণ্ঠন আরম্ভ করিল, আর "যাহারা কোনরূপে শান্তির ব্যাঘাত করে নাই,

ইংরাজ সৈনিকের সঙ্গীনে তাহাদের হৃদয় বিদ্ধ, তরবারিতে দেহ বিচ্ছিন্ন বা বন্দুকের গুলিতে মস্তক বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল।.....দিল্লী অধিকারের পর প্রথম কয়েক দিন এইরূপে নিরীহ, নির্দ্দোষ লোক বন্দুকের গুলিতে বা অন্যরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সাহস ও রণকৌশলে প্রসিদ্ধ ইংরাজ বীরপুরুষগণের মধ্যে অনেকে এই নিন্দনীয় কর্ম্মের ভার স্বয়ং গ্রহণ না করিলেও উহার অনুমোদন করিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই।" যা'রা আহত হইয়া পড়িয়াছিল, তা'দিগকেও গুলি করিয়া বধ করা হইল। দিল্লীর বৃদ্ধ বাদশাহ বাহাদুর শাহ, তাঁ'র বেগম জীন্নত্ মহল এবং পুত্র জোয়ান বখতকে বন্দী করিয়া আনিয়া কাপ্তেন হাড্‌সন দেওয়ানী কর্ম্মচারী সণ্ডার্স্-সাহেবের হস্তে সমর্পণ করিলেন। দিল্লীর বাদশাহের আত্মীয় এবং তাঁ'র পরিবারের অন্তর্ভুক্ত রজীব আলি ও এলাহি বক্স ইংরাজ-পক্ষের চরের কাজ করিয়া বাদশাহ, বেগম ও জোয়ান বখতকে বন্দী করাইয়াছিল এবং বাদশাহের অপর তিন পুত্রকে সামান্য অপরাধীর ন্যায় ধরিয়া আনিবার সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল। ইঁহাদের কোনরূপ বিচারেরও দরকার হইল না, বন্দী করিয়া আনিবার সময় পথেই হাড্‌সন-সাহেব এই

তিন জন রাজকুমারকে স্বহস্তে গুলি করিয়া বধ করিলেন। তাঁ'দের মৃতদেহ যা'তে সর্ব্বসাধারণে দেখিতে পায়, এই জন্য সেগুলি কোতোয়ালীর সম্মুখে রাখিয়া দেওয়া হইল।

বাদশাহ ইংরাজদের বন্দী হইয়া রহিলেন। "প্রতি-দিন, প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে, ম্যাজিষ্ট্রেট্ স্যর টমাস্ মেট্‌কাফের বিচারে অবাধে লোকের ফাঁসি হইতে লাগিল।" এই যুদ্ধে নিকলসনকে হারাইয়াও ইংরাজগণ এইরূপে দিল্লীতে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিলেন।

৯

শিয়ালকোট ও মিয়াঁমিরের সিপাহী

পঞ্চনদের সর্ব্বত্রই বিদ্রোহের আগুন ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং সকল সেনানিবাসই অল্পাধিক পরিমাণে আলোড়িত হইয়াছিল।

ঝিলম সৈনিক-নিবাসে একদল সিপাহী ছিল। স্যর জন লরেন্স তা'দিগকে নিরস্ত্র করা স্থির করেন এবং একদল ইউরোপীয় সৈন্য ও কতকগুলি কামান পাঠাইয়া দেন। যখন কামান লইয়া ইংরাজ সৈন্য সেনানিবাসের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন সিপাহীরা অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তা'দের উপর গুলিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। সমস্ত দিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। সিপাহীদের পরাক্রমে ইংরাজ সৈন্য সেদিন পরাজিত হইল। পরদিন প্রাতঃকালে সিপাহীরা সে-স্থান ছাড়িয়া চলিয়া গেল। তা'দের মধ্যে যা'রা কাশ্মীরে গিয়া আশ্রয় লইল, কাশ্মীরের রাজা তা'দিগকে নানা উপায়ে বন্দী করিয়া ইংরাজদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ইংরাজগণের কামানের মুখে তা'দের প্রাণ গেল।

শিয়ালকোটে একটি প্রধান সৈনিক-নিবাস ছিল।

এই সেনানিবাসের সিপাহীরা চারিদিকের সংবাদ পাইয়া মনে করিয়াছিল যে, তা'দিগকেও নিরস্ত্র করা হইবে। তা'রা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিল। ইংরাজগণ উপায়ান্তর না দেখিয়া শিখ সর্দ্দার তেজসিংহের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শিখ সর্দ্দারের এই বাড়ীটিকে পুরাতন দুর্গ বলা হইত। সিপাহীরা কারাগার ভাঙিয়া কয়েদীদিগকে বাহির করিল, ধনাগারের টাকা লুঠ করিল, আদালত পোড়াইয়া দিল, ইংরাজদের আবাস-গৃহ সকল বিনষ্ট করিল। তা'র পর বারুদখানা উড়াইয়া দিয়া সিপাহীরা শিয়ালকোট পরিত্যাগ করিল। এই সকল উত্তেজিত পলায়িত সিপাহীরা যখন চন্দ্রভাগাতীরস্থ ত্রিমুঘাটে উপস্থিত হইল, তখন নিকলসন তা'দিগকে আক্রমণ করিলেন। ইংরাজ সৈন্যের সহিত এই যুদ্ধে সিপাহীরা পরাজিত হইয়া অস্ত্রশস্ত্রাদি সব ফেলিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তা'দের ১২০ জন নিহত হইল, অনেকে চন্দ্রভাগার জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বাঁচাইতে গিয়া প্রাণ দিল। কিন্তু ৩০০ সিপাহী কোনও রকমে সাঁতরাইয়া নদীর মধ্যে একটি দ্বীপে আশ্রয় লইল। নিকলসন নৌকা সংগ্রহ করিয়া সসৈন্যে সেই দ্বীপে গিয়া উপস্থিত হইলেন, সুতরাং কেহই নিষ্কৃতি

পাইল না। তা'র পর অন্যান্য স্থানের মত এখানেও নানা জায়গায় হত্যাকাণ্ড ও ফাঁসি আরম্ভ হইল।

স্যর জন লরেন্স এই নিকলসনকেই অধিনায়ক করিয়া বহু বেলুচী, শিখ ও ইউরোপীয় সৈন্যসহ দিল্লী উদ্ধারের জন্য পাঠাইয়াছিলেন।

এ-দিকে ৩০শে জুলাই মিয়াঁমিরের পদাতিক সিপাহীর দল আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া চঞ্চল হইল। হঠাৎ প্রচণ্ড ধূলি-ঝড় হইয়া চারিদিক্ একেবারে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, কাজেই সিপাহীরা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িল। এই অবস্থায়, কোনরূপ অনুসন্ধান না করিয়াই শিখেরা তা'দের উপর বেপরোয়া ভাবে গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল। নিরুপায় সিপাহীরা পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। অথচ তা'দিগকে দণ্ড দেওয়ার জন্য ফ্রেডরিক্ কূপার আশি-নব্বই জন অশ্বারোহী লইয়া তা'দের পশ্চাতে প্রবলবেগে ছুটিলেন। সিপাহীরা ইরাবতীর তীরে গিয়া থামিল। পল্লীবাসীরা সাহায্য তো করিলই না, বরং তা'দিগকে ধরাইয়া দিল। ফলে ১২০ জন সিপাহীর ভবলীলা ঐ-খানেই সাঙ্গ হইল। যা'রা জলে ঝাঁপ দিয়া অতি কষ্টে প্রাণ বাঁচাইল এবং সাঁতরাইয়া একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে গিয়া উঠিল, তা'দিগকেও

নৌকা করিয়া ধরিয়া আনা হইল। ২৮২ জন সিপাহীকে বাঁধিয়া রাত্রিতে উজনালায় লইয়া আসা হয়। তা'র পর কূপার-সাহেবের আদেশে সিপাহীদিগকে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়ো করাইয়া শিখেরা তা'দিগকে গুলি করিয়া বধ করিতে লাগিল। এইরূপে ২৩৭ জনকে বধ করিবার পর অবশিষ্ট সিপাহীদিগকে বধ্যভূমিতে আনিতে গিয়া দেখা গেল, যে অতি ক্ষুদ্র গৃহে তা'দিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, সেই গৃহেই শ্বাসরোধ হইয়া তা'রা মরিয়া রহিয়াছে। উজনালার পুলিশ ষ্টেশনের কিঞ্চিৎ দূরে একটি প্রকাণ্ড কূপ ছিল, সমস্ত মৃতদেহ সেই কূপে নিক্ষেপ করা হইল। কূপার-সাহেবের কৃতিত্বে আনন্দিত হইয়া প্রধান কমিশনার স্যর জন লরেন্স তাঁ'কে ধন্যবাদ দিয়া পত্র লিখিলেন, আর দেশীয় রাজগণ যে তাঁ'কে নানাপ্রকারে সম্মানিত করিলেন সে-কথা বলাই বাহুল্য। শিখেরাও পুরস্কৃত হইল। এই সিপাহীদলের আর আর যা'দের পাওয়া যায় তা'দের বিনা বিচারে তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হয়।

১০

বাংলাদেশে

সিপাহী বিদ্রোহের অগ্নিশিখা কলিকাতায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে নাই বটে, কিন্তু চারিদিকের বিপ্লবের সংবাদে ইউরোপীয়দিগের মধ্যে গভীর আতঙ্ক ও উত্তেজনা দেখা দিয়াছিল। তাঁ'রা স্বেচ্ছাসৈনিকদল গঠন করিয়া কুচ-কাওয়াজ করিতে লাগিলেন, আর অহরহ চারিদিকে শুধু বিপ্লবের বিভীষিকা দেখিয়া চমকিত হইতে লাগিলেন। ইউরোপীয়গণ তখন সিপাহীদিগকে তো সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিতেনই, এমন কি ভারতবাসী মাত্রকেই যেন তাঁ'রা মহাশত্রু বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। কাজেই অন্যান্য বহু স্থানের মত বারাকপুরের সিপাহীদিগকেও হঠাৎ একদিন কাওয়াজের ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া, সশস্ত্র ইউরোপীয় সৈন্য দণ্ডায়মান করিয়া, চারিদিকে বারুদভরা কামান পাতিয়া, নিরস্ত্র করা হইল। তা'র পর বড়লাট লর্ড ক্যানিংয়ের প্রাসাদ ও দেহরক্ষার জন্য নিযুক্ত দেশীয়

সিপাহীদের তুলিয়া দিয়া ইউরোপীয় সৈন্য নিযুক্ত করা হইল।

দেশের মধ্যে যা'তে অলীক উত্তেজনার সৃষ্টি না হয় সেজন্য মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হইল, সরকারের 'লাইসেন্স' না লইয়া কেহ মুদ্রাযন্ত্র রাখিতে পারিত না; দরকার বোধ করিলেই সরকার যে-কোন সংবাদপত্র বা পুস্তক প্রচার বন্ধ করিতে পারিতেন। ইহার সঙ্গে যে কঠোর অস্ত্র আইনেরও প্রবর্ত্তন হইয়াছিল তা' বলাই নিষ্প্রয়োজন।

তখন অযোধ্যার নবাব কলিকাতায় অবরুদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। অযোধ্যাপ্রদেশ কোম্পানী যে কি ভাবে অধিকার করিয়াছিলেন তা' পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এই অবরুদ্ধ নবাবের উপরও সরকারের ঘোরতর সন্দেহ হইতে লাগিল। পাছে নবাবের দ্বারা কোনরূপ ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হয়, শুধু এই সন্দেহেই তিনি কলিকাতার দুর্গে অবরুদ্ধ হইলেন। এইরূপে কলিকাতায় শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা হইল।

চট্টগ্রামে তখন একদল সিপাহী ছিল। তা'রা বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ করিতেই ইউরোপীয়গণ ছদ্মবেশে জঙ্গল দিয়া পলায়ন করেন। কাজেই সিপাহীরা বিনা

বাধায় ধনাগার লুণ্ঠন ও কারাগারের কয়েদীদিগকে মুক্ত করিল। তা'র পর সৈনিকনিবাস পোড়াইয়া ও অস্ত্রাগার উড়াইয়া দিয়া ত্রিপুরার দিকে ধাবিত হইল। ত্রিপুরার মহারাজা এই সময় ইংরাজদিগকে সাহায্য করিতে সম্মত হইয়া সিপাহীদিগকে আক্রমণ করিলেন। এ-দিকে শ্রীহট্টের সিপাহিগণও ইংরাজ-পক্ষে থাকিয়া বিদ্রোহীদের আক্রমণ করিল। বিদ্রোহী সিপাহীরা উপায়ান্তর না দেখিয়া মণিপুরের নিকটবর্ত্তী দুর্গম বনে পলায়ন করিল। কিন্তু শ্রীহট্টের সিপাহিগণের বার বার আক্রমণে তা'রা অনেকেই নিহত হইল। যা'রা জীবিত ছিল তা'রাও সেই বনের মধ্যে অতি শোচনীয় ভাবেই রহিল।

ইহার পর ঢাকার সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করা স্থির হয়। মালগুদাম ও ধনাগারের সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিয়া ইংরাজ সেনানায়কগণ লালবাগ কেল্লায় উপস্থিত হইলেন। তখন লালবাগের সিপাহীরা উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ইংরাজ সেনানায়কগণ তা'দিগকে অবরোধ করিয়া গুলি চালাইতে লাগিলেন। সিপাহীরাও গুলি চালাইল। সেনানায়কগণ অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তখন সিপাহীরা ঢাকা

ছাড়িয়া জলপাইগুড়ির দিকে যাত্রা করিল। তিস্তানদীর তীরে ইউল-সাহেব তা'দিগকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু সিপাহীদের গতিরোধ হইল না। শেষে তা'রা নেপালের জঙ্গলের মধ্য দিয়া অযোধ্যার উত্তর-পশ্চিমাংশে পলায়ন করিল।

১১

বিহারে—কুমার সিংহ

বিহার প্রদেশেও গভীর উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য বিশেষ-ভাবেই আত্মপ্রকাশ করে। তখন পাটনা অঞ্চলে বহু মুসলমান বাস করিত, তা'রা উত্তেজিত ও চঞ্চল হইয়া উঠে। পাটনা বিভাগের কমিশনার টেলর-সাহেব তা'দের প্রতি এত কঠোরতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন যে, পাটনার কোন মুসলমানই এ-সময়ে ক্ষণকালের জন্যও নিজেকে নিরাপদ মনে করে নাই। কখন যে কে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিবে, কা'র সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবে, কিছুই ঠিক ছিল না। কাওয়াজের প্রশস্ত ভূমি বধ্য-ভূমিতে পরিণত হইল।

তখন পাটনায় তিনজন অতি প্রভাবশালী বিশিষ্ট মৌলবী ছিলেন। তাঁ'দের বহু শিষ্য ছিল, যথেষ্ট সম্মান ছিল। টেলর-সাহেব তাঁ'দিগকে সন্দেহ করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রকাশ্যে গ্রেপ্তার করিতে সাহস করিলেন না। তা'র পর একদিন পরামর্শের ছলে তিনি তাঁ'দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন এবং তাঁ'দের বন্দী করিয়া আতিথ্যের মর্য্যাদা রক্ষা

করিলেন! ইহাতে জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ ও বিদ্বেষ বাড়িয়াই গেল।

দানাপুরেও কয়েক দল সিপাহী ছিল। তা'রা অবিশ্বাসের কোন কাজই করে নাই, অসন্তোষের কোন লক্ষণই প্রকাশ করে নাই, তথাপি তা'দিগকে নিরস্ত্র করা স্থির হইল। দানাপুরের সেনাপতি স্থির করিলেন যে, সিপাহীদের বন্দুকের ক্যাপ্ ইউরোপীয় সৈনিকদের অধিকারে রাখিবেন। যদি ক্যাপ্ই না পায়, তবে বন্দুক থাকিলেও সিপাহীরা কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। এই 'সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে' নীতিই এক গোলযোগ ঘটাইল। কাওয়াজের ক্ষেত্রে অন্যান্য স্থানের মত সমস্ত তোর-জোর ঠিক করিয়া সিপাহীদিগকে লইয়া যাওয়া হইল। দুই দল সিপাহী ইহাতে বিশেষ উত্তেজিত হইল, তৃতীয় দল শান্তই ছিল; কিন্তু কয়েকজন ইউরোপীয় সৈনিক এই শান্ত দলের উপরই গুলি চালাইতে লাগিল। কাজেই তিন দলই সমূহ বিপদ বুঝিয়া, সামরিক পোষাক পরিত্যাগ করিল এবং কেবল অস্ত্রাদি লইয়া দানাপুর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তা'রা প্রায় বিনা বাধায় আরায় পৌঁছিল।

এই উত্তেজিত সিপাহীদিগকে যে বৃদ্ধ রাজপুত

ভূম্যধিকারী উৎসাহ দেন ও সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করেন তিনি সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক বাবু কুমার সিংহ। সমস্ত বিহার প্রদেশেই তাঁ'র ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অসাধারণ ছিল। আজও তাঁ'র নাম বিহারের লোকে ভুলে নাই।

বীর কুমার সিংহ আরা জিলার ভূস্বামী, তাঁ'র বাস ছিল আরার নিকটস্থ জগদীশপুরে। ইনি বৃদ্ধবয়সে পুত্রহীন হইয়া অশান্তিতে ছিলেন বটে, কিন্তু দেশের ও দশের প্রতি কর্ত্তব্যে তিনি কখনও উদাসীন হ'ন নাই। তিনি প্রথম জীবনে রাজভক্ত বলিয়াই পরিচিত ছিলেন, কিন্তু রাজপুরুষদের মিথ্যা সন্দেহ ও অবিশ্বাস তাঁ'কে বিরক্ত করিয়া তোলে। কমিশনার টেলর-সাহেব তাঁ'কে আনিবার জন্য একজন দূত পাঠাইলেন। কুমার সিংহ বুঝিলেন যে, পাটনার মৌলবীদের মত তাঁ'কেও অবরুদ্ধ করা হইবে, সুতরাং ব্যারামের ওজরে তিনি দূতের সঙ্গে টেলর-সাহেবের বাড়ী যাইতে অসম্মত হইলেন। কর্ত্তৃপক্ষ যে ইহাতে মোটেই খুসী হইলেন না ইহা ভাল করিয়া বুঝিয়াই, জীবনের সায়াহ্নেও বার্দ্ধক্যের অবসাদ ও জড়তা ভুলিয়া গিয়া, কুমার সিংহ অসীমশক্তিশালী বৃটিশসিংহের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন এবং স্বয়ং সিপাহীদিগকে

পরিচালনা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁ'রই কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁ'র সহকারী হইলেন। আরার ইংরাজ-গণ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া যে বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন, সেই বাড়ী অবরোধ করা স্থির হইল।

সিপাহীরা জেলখানা হইতে কয়েদীদিগকে মুক্তি দিল ও ধনাগার লুণ্ঠন করিল ; তা'র পর তা'রা ইংরাজদের আশ্রয়দুর্গ অবরোধ করিল। এই আশ্রয়দুর্গে ইংরাজ-গণের সাহায্যার্থ ৫০ জন শিখও ছিল। কিন্তু যুদ্ধের ভাল উপকরণ না থাকাতে এবং ইংরাজদের আশ্রয়দুর্গ বালিপূর্ণ থলে' দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় সিপাহীরা কিছুই করিতে পারিল না। এ-দিকে দানাপুর হইতে কাপ্তেন ডান্‌বারের অধীনে একদল ইউরোপীয় সৈন্য জাহাজে করিয়া আরার দিকে রওনা হইল। জাহাজ যেখানে আসিল সেখান হইতে নৌকায় করিয়া কতকদূর আসিয়া সৈনিকদল চলিতে আরম্ভ করিল। তখন রাত্রি হইয়াছে, চারিদিকেই ঘোর অন্ধকার। সৈনিক-দল যেমনি আরার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, অমনি পথের পার্শ্বস্থিত বনের মধ্য হইতে সিপাহীদের গুলি আসিয়া তা'দের উপর পড়িতে লাগিল। প্রথমেই কাপ্তেন ডান্‌বার নিহত হইলেন। অন্ধকারে শত্রুপক্ষের গুলিতে

সৈন্যদলের অনেকেই চিরনিদ্রায় নিমগ্ন হইল। যা'রা বাকী রহিল তা'রা আরায় না গিয়া জাহাজের দিকে ছুটিল। কিন্তু সেখান হইতে জাহাজ বারো মাইল দূরে ছিল। রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল, আবার তা'দের উপর চারিদিক হইতে গুলি পড়িতে লাগিল। ৪০০ সৈন্যের মধ্যে মাত্র ৫০ জন জীবন লইয়া জাহাজে পৌঁছিল।

এই সময়ে ভিন্‌সেণ্ট আয়ার সসৈন্যে কলিকাতা হইতে এলাহাবাদে যাইতেছিলেন। তিনি এই ভীষণ দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া দানাপুর হইতে নিজের সৈন্য ও কয়েকটি কামান লইয়া আরায় যাত্রা করেন। আরার পথে কুমার সিংহের সৈন্যগণ তাঁ'কে বাধা দেয়, কিন্তু কুমার সিংহের কামান না থাকায় তাঁ'র চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আয়ার আরায় পৌঁছিলেন বটে, কিন্তু অশীতিপর বৃদ্ধ কুমার সিংহের বীরত্বে ইংরাজ সৈন্যকে বিশেষ বিব্রত হইতে হইল। আয়ার কুমার সিংহের বাসভবন জগদীশপুরে গিয়া তাঁ'র বাড়ীঘর, দেবালয় ইত্যাদি সবই ধ্বংস করিলেন। ইউরোপীয় সৈন্যগণ জগদীশপুরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকল অগ্নিসাৎ করিয়া পল্লীবাসিগণকে নিহত করিল। যা'রা

যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল তা'দের শব গাছে গাছে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইল। তা'র পর আয়ারের সৈন্যগণ দানাপুরে ফিরিয়া অমানুষিক নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া তা'রা পল্লীদাহে, নরহত্যায় ও লুণ্ঠনে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে লাগিল। বহু শ্যামল পল্লী মহাশ্মশানে পরিণত হইল।

কুমার সিংহ অন্তঃপুরের মহিলাদিগকে পূর্ব্বেই তাঁ'দের পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। জগদীশপুরে সিপাহীদের পরাজয় হইলে, ইংরাজের হাতে আত্মসমর্পণ না করিয়া তিনি সাসারামের নিকটবর্ত্তী এক পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁ'র নামে—তাঁ'র উৎসাহ ও উত্তেজনায় বহু স্থানের সিপাহীর হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। বহু যুদ্ধে তিনি অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেন। আজিমগড়ের ইংরাজগণ তাঁ'রই পরাক্রমে কারাগারে আশ্রয় লইতে বাধ্য হ'ন। তা'র পর লর্ড মার্কার সসৈন্যে আজিমগড়ে আসিয়া তাঁ'দিগকে রক্ষা করেন। শুধু কুমার সিংহের জন্যই ইংরাজ সৈন্যকে পদে পদে বাধা পাইতে হয়।

জগদীশপুরে পরাজিত হইয়াও কুমার সিংহ নিশ্চেষ্ট

ছিলেন না। তিনি গঙ্গা পার হইয়া পাল্কীতে চড়িয়া যাইতেছিলেন। সবেমাত্র ভোরের আলো আসিয়া তাঁ'র দেহে পড়িয়াছে, অমনি একজন অনুচর তাঁ'র মাথায় রাজছত্র ধরিল। বিপক্ষ ছত্র দেখিয়াই সব বুঝিতে পারিল এবং গঙ্গার অপর তীর হইতে ছত্র লক্ষ্য করিয়া কামানে অগ্নিসংযোগ করিল। ছত্রধর ও পার্শ্বচর নিহত হইল। কুমার সিংহের বাহুর সন্ধিস্থল ভাঙ্গিয়া গেল এবং উরুদেশের খানিকটা মাংস উড়িয়া গেল। তাঁ'রই আদেশে তাঁ'র আহত হস্তটি কাটিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করা হইল এবং তাঁ'কে একটি খাটিয়ায় শায়িত করা হইল। এই খাটিয়ায় শুইয়াই তিনি অনুচর সহ জগদীশপুরে উপস্থিত হইলেন। এ-দিকে কাপ্তেন লে গ্রাণ্ড্ আরা হইতে সৈন্য লইয়া জগদীশপুরে অভিযান করিলেন; কিন্তু জগদীশপুরের নিকটে কুমার সিংহের সিপাহিগণ এমন প্রচণ্ড বিক্রমে তাঁ'কে আক্রমণ করিল যে, তিনি তাঁ'র দলের ১০৩ জন সৈন্য সহ নিহত হইলেন। বাকী সৈন্য বেগতিক দেখিয়া আরায় পলায়ন করিল।

নিজের ধ্বংসপ্রাপ্ত চিরপ্রিয় আবাসস্থলে গিয়া এবং লে গ্রাণ্ড্কে পরাজিত করিয়া এই বৃদ্ধ বীরপুরুষ দেহত্যাগ করিলেন। তাঁ'র মৃত্যুর পর তাঁ'র কনিষ্ঠ

ভ্রাতা অমর সিংহ সিপাহীদিগকে দলবদ্ধ করিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত নানাস্থানে ইংরাজদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন। পরাজয়ে না দমিয়া তাঁ'র দল যেখানে ইংরাজদিগকে দেখিতে পাইল সেইখানেই তাঁ'দিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল। তা'রা জঙ্গলের মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া, সুযোগ মত বাহির হইয়া বিপক্ষকে আক্রমণ করিত। তা'রা গয়ার কারাগারের কয়েদী-দিগকে মুক্ত করিয়া ইংরাজদিগকে নগর হইতে বিতাড়িত করে। এই সময়ে সেনানায়ক ডগ্‌লাস্ সাত হাজার সুশিক্ষিত সৈনিক-পুরুষ লইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু এই সৈন্য লইয়াও তিনি দুই মাসের মধ্যে অমর সিংহের বিশেষ কিছুই করিতে পারিলেন না। এ-দিকে স্যর হেন্‌রি হ্যাব্‌লক্ নূতন কৌশলে অমর সিংহের সৈন্যদলকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সিপাহীদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া হ্যাব্‌লক্ পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রিতে ২০১ মাইল পথ অতিক্রম করেন। একদিকে ডগ্‌লাস্, অন্যদিকে সসৈন্যে হ্যাব্‌লক্, সিপাহি-গণ মাঝখানে আবদ্ধ হইল। ইহা সত্ত্বেও সিপাহীরা সুকৌশলে পলায়ন করে। ক্রমাগত সাত মাস যুদ্ধের পর অমর সিংহের সিপাহীদলের পরাজয় ঘটে

এবং জগদীশপুর সম্পূর্ণরূপে ইংরাজগণের করায়ত্ত হয়।

এক দিকে টেলর-সাহেব আর এক দিকে নীলকুঠির সাহেবদের যথেচ্ছাচারে জনসাধারণ তো অত্যন্ত বিচলিত হইয়াই ছিল। তা'র উপর এই সময়ে চারিদিকের বিদ্রোহের বিভিন্ন সংবাদে সিপাহীরাও উত্তেজিত হইয়া উঠে। পাটনা হইতে বারো মাইল দূরে সিগৌলি নামক স্থানে এক দল সিপাহী ছিল। তা'রা বিদ্রোহী হইয়াই সেখানকার সকল ইউরোপীয়কে আক্রমণ করিয়া নির্দ্দয়-ভাবে হত্যা করিল; দেশীয় ব্যক্তিবিশেষের দয়ায় মাত্র একটি বালিকার প্রাণ রক্ষা হইল। তা'র পর সিপাহীরা ইউরোপীয়দের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন ও তাঁ'দের বাসগৃহ অগ্নিসাৎ করে এবং দলবদ্ধ হইয়া প্রস্থান করে।

ছোটনাগপুরের নানা স্থানেও বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। হাজারিবাগ, রাঁচি, চাইবাসা, পুরুলিয়া প্রভৃতি স্থানেও সিপাহিগণ উত্তেজিত হইয়া ধনাগার লুণ্ঠন করে, কারাগারের কয়েদীদিগকে মুক্তি দেয় এবং ইউরোপীয়দের গৃহ ও সম্পত্তি বিনষ্ট করে। ছোটনাগপুরের সকল সিপাহী বিদ্রোহে যোগ দেয় নাই, বরং বহু সিপাহী ইংরাজ-পক্ষে

যোগ দিয়া স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধেই অস্ত্রধারণ করে।

ছোটনাগপুরের বিদ্রোহী সিপাহীদের সহিত ইংরাজ সৈনিকদের চাতরা নামক স্থানে এক যুদ্ধ হয়। ইংরাজ-পক্ষের ৪২ জন হতাহত হয়; কিন্তু শেষে সিপাহীরা হারিয়া যায়। ছোটনাগপুরে সম্পূর্ণরূপে শান্তি স্থাপন করিতে কর্ত্তৃপক্ষের প্রায় এক বৎসর সময় লাগে। অন্যান্য স্থানের মত এখানেও সৈনিকপুরুষগণ পল্লীদাহ ও নরহত্যা ইত্যাদি করিয়া চরম কঠোরতা প্রকাশ করেন।

১২

রোহিলখণ্ড, ফতেগড় ইত্যাদি স্থানে

সিপাহী বিদ্রোহের সময় উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ছোট লাট ছিলেন জন কল্‌বিন সাহেব। বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য তিনি ভারতের বহু ভূপতির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন, এবং তাঁ'রাও আগ্রহের সহিত সাহায্য করেন।

আলিগড়ের সৈনিকনিবাসে দিল্লী, মিরাট প্রভৃতি স্থানের সংবাদে সিপাহীদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা দেখা দেয়। সেই সময়ে একজন পল্লীবাসী ব্রাহ্মণের উপর অনেক রাজকর্ম্মচারীর সন্দেহ হয়। সিপাহীদেরই একজন ভারতীয় 'অফিসর' পরামর্শ করিবার ছলে এই ব্রাহ্মণকে কোনও এক গুপ্তস্থানে লইয়া যা'ন এবং তাঁ'কে কৌশলে অবরুদ্ধ করিয়া ইংরাজ রাজপুরুষদের হস্তে সমর্পণ করেন। তখন তখনই তাঁ'র বিচার হইল এবং সেই দিনই তাঁ'র দেহ সকলের সম্মুখে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিল। এই ব্যাপারে সিপাহীরা একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। ইউরোপীয়গণ বেগতিক দেখিয়া কেহ কেহ আগরার দিকে, কেহ কেহ বা মিরাটের দিকে পলায়ন

করিলেন। সিপাহীরা ধনাগার লুণ্ঠন করিল, ইউরোপীয়-দের বাসগৃহ দগ্ধ করিল এবং কারাগারের কয়েদী-দিগকে মুক্ত করিয়া দিল।

ইটোয়ার সিপাহীদলও আলিগড়ের সিপাহীদের অনুরূপ লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি কার্য্য করিল। এই সময়ে ভারতীয় ভূস্বামিগণ নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়াও ইংরাজ রাজপুরুষদিগকে সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা করেন।

মথুরার সিপাহীরা প্রথমেই ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া বিদ্রোহ প্রকাশ করে। ভরতপুরের সিপাহীরাও বিদ্রোহী হয়। কাজেই আগরার সিপাহিগণ শান্তভাবে থাকিলেও অন্যান্য স্থানের মতই বিরাট আয়োজন করিয়া, বিনা বাধায় তা'দিগকে নিরস্ত্র করা হয়।

মিরাটের উত্তরস্থিত মুজঃফরনগরের ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ বর্‌ফোর্ড্ মিরাটের সংবাদে এতই ভয় পাইলেন যে, তিনি সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়াও আত্মপ্রাণ রক্ষায় প্রস্তুত হইলেন। তিনি সমস্ত আফিস বন্ধ করিয়া দিয়া, ধনাগাররক্ষক সিপাহী এবং শেষে কারাগাররক্ষক সিপাহীদিগকেও সঙ্গে লইয়া নগরের প্রান্তভাগে নির্জ্জন জঙ্গলে লুকাইয়া রহিলেন। প্রহরী না থাকায় কয়েদিগণ আপনাআপনিই বিমুক্ত হইল, উত্তেজিত জনসাধারণ বিনা বাধায় ধনাগার

লুণ্ঠন ও সরকারী কর্ম্মচারিগণের আবাসগৃহগুলি ভস্মীভূত করিল। জিলাময় রাষ্ট্র হইল যে, কোম্পানীর শাসন-ক্ষমতা লুপ্ত হইয়াছে। এখানে মাত্র ৩৫ জন সশস্ত্র সিপাহী ছিল, তা'রা উত্তেজিত না হইয়া বরাবরই বিশ্বস্ত ছিল। শুধু ম্যাজিষ্ট্রেটের ভয়ে এবং বিবেচনার অভাবে এই কাণ্ড ঘটিল।

রোহিলখণ্ডের প্রধান নগর বেরিলির সেনানিবাসের সিপাহীদের মধ্যে গভীর উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়। মে মাস শেষ হইতে না হইতেই ধূমায়মান বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। ৩১শে মে সিপাহীরা অত্যন্ত অশান্ত হইয়া উঠিল। ইউরোপীয়গণ প্রমাদ গণিলেন এবং দূরে এক আমবাগানের মধ্যে গিয়া জড় হইলেন। তাঁ'দের আবাসস্থলে অগ্নি-শিখা গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সিপাহিগণ যে-কোন ইউরোপীয়কে দেখিতে পাইল তাঁ'কেই গুলি করিল। তাঁ'দের বৃদ্ধ সেনাপতি নিহত হইলেন। তখন ইউরোপীয়গণ আমবাগান ছাড়িয়া নৈনিতালের দিকে পলায়ন করিলেন। এই মহাসঙ্কট-কালে ২৩ জন বিশ্বস্ত সিপাহী তাঁ'দিগকে নিরাপদে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবার জন্য তাঁ'দের সঙ্গে গেল। ধনাগার লুণ্ঠিত হইল, কয়েদিগণ মুক্তিলাভ করিল, অনেক

ইউরোপীয় নিহত হইলেন। এবার খাঁ বাহাদুর খাঁ নামে একজন বিশেষ প্রতিপত্তিশালী মুসলমান রোহিলখণ্ডের সুবাদার হইলেন। তাঁ'র বিচারে বহু খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীর ফাঁসি হইল। তা'র পর দিল্লীর বাদশাহের নামে তিনি রাজস্ব আদায় করিতে লাগিলেন।

যে-দিন বেরিলিতে বিপ্লব আরম্ভ হয় ঠিক সেই ৩১শে মে রবিবার দিন শাজাহানপুরেও ঘোরতর বিপ্লব হয়। ইউরোপীয়দের বাসগৃহ পুড়িল, ধনাগার লুণ্ঠিত হইল, কয়েদীরা মুক্তিলাভ করিল। বিদ্রোহ আরম্ভ হইবার প্রাক্কালে ইউরোপীয়গণ উপাসনা-মন্দিরে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁ'দের উপর হঠাৎ আক্রমণ হওয়ায়, কয়েক জন নিহত হইলেন। কতকে ভয়ার্ত্ত হইয়া মহিলাদের সহ দ্বার রুদ্ধ করিয়া উপাসনা গৃহেই রহিলেন। তাঁ'দের এ-দেশীয় বিশ্বস্ত ভৃত্যেরা বন্দুক, পিস্তল ইত্যাদি আনিয়া দিয়া প্রভুদের সাহায্য করিল এবং প্রায় একশত সিপাহী তাঁ'দের পক্ষাবলম্বন করিল। ইহাদের সাহায্য পাইয়া ইউরোপীয়গণ অযোধ্যার প্রান্তস্থিত মোহমদীতে পলায়ন করেন

সমগ্র রোহিলখণ্ডে খাঁ বাহাদুর খাঁর আধিপত্য ঘোষিত হইল।

এ-দিকে আগ্রা বিভাগের ফতেগড়েও বিপ্লব ঘনীভূত হইয়া উঠে। ফতেগড়ের সিপাহীরা বেরিলি ও শাজাহানপুরের সংবাদে অত্যন্ত বিচলিত হয়। কর্ণেল স্মিথ অবস্থা খারাপ বুঝিয়া মহিলা, বালক-বালিকা এবং যুদ্ধে অসমর্থ ব্যক্তিদিগকে কানপুরে পাঠানো স্থির করিলেন। কানপুরে বহু ইংরাজ সৈন্য আসিয়াছে বলিয়া তিনি সংবাদ পাইয়াছিলেন। বারো-তেরো খানি নৌকায় শেষ রাত্রে ১৭০ জনকে ফতেগড় হইতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। ফতেগড়ের সিপাহীদের ভারতীয় 'অফিসার'গণের কথানুযায়ী কর্ণেল স্মিথ ১২০ জন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী সহ দুর্গে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; কিন্তু দুর্গ সুদৃঢ় ছিল না, খাদ্যও সেখানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ করা হয় নাই। ১২০ জন লোকের মধ্যে মাত্র এক-চতুর্থাংশের অস্ত্র ধরিবার যোগ্যতা ছিল। ইহাদের লইয়াই তিনি দুর্গ রক্ষায় প্রস্তুত হইলেন। এই সময় একদল সিপাহী ইংরাজের বিরোধী হইয়া উঠিল। ফরাক্কাবাদের নবাব তফ্‌জুল হোসেন খাঁকে ইহারা নবাব বলিয়া ঘোষণা করিল, কারাগার হইতে কয়েদী দিগকে মুক্ত করিল, ধনাগার লুঠ করিল। তা'র পর আর একদল সিপাহীও ইহাদের সঙ্গে যোগ দিল। এই

সম্মিলিত সিপাহীদল ইংরাজদের আশ্রয়দুর্গ আক্রমণ করা স্থির করিল।

দুইদিন ধরিয়া দুর্গে গোলাবর্ষণ করিয়াও সিপাহীরা কিছু করিতে পারিল না। ইংরাজগণ অটল উদ্যমে, বীর বিক্রমে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই দুর্গ স্থানে স্থানে ভগ্ন হইল, দুইটি কামান অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল, গোলা-গুলি নিঃশেষ হইয়া আসিল, মহিলা ও শিশুগণের দুরবস্থার একশেষ হইল। সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প হইয়াও ইংরাজগণ অসাধারণ সাহস ও ধৈর্য্য সহকারেই যুদ্ধ করিতেছিলেন, কিন্তু যখন আর কোন উপায়ই রহিল না তখন তাঁ'রা পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

তখন বর্ষাকাল। ভাগীরথী দু'কূল ভাসাইয়া পূর্ণবেগে ছুটিয়াছে। তিনখানি নৌকা সংগ্রহ করিয়া একশত জন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ফতেগড় হইতে পলায়ন করিলেন। কিছুকাল পরেই সিপাহীরা ইহা বুঝিতে পারিল; তখনই তা'রা নৌকা করিয়া পলাতকদের অনুসরণ করিল। এ-দিকে পলাতকদের একখানি নৌকা চড়ায় আট্‌কাইয়া গেল। ইতিমধ্যে সিপাহীরা উপস্থিত হইয়া তা'দের বিনাশ করিল। অসহায় নারী ও শিশু পর্য্যন্ত ভাগীরথীর বুকে

এমনি করিয়া আত্মবিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইল। শুধু এক কর্ণেল স্মিথ যে নৌকায় ছিলেন সেই নৌকা কানপুরের দিকে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইল। পথ-পার্শ্বস্থ সহৃদয় পল্লীবাসিগণ ইঁহাদের নানাপ্রকারে সাহায্য করে। তা'র পর তাঁ'দের কি হয় সঠিকরূপে জানা যায় না।

মাত্র তেইশ বৎসরের তরুণ যুবক জয়াজী রাও সিন্ধিয়া গোয়ালিয়রের রাজা ছিলেন। সামন্ত সন্ধি অনুসারে (subsidiary alliance) বরাবরই তাঁ'র রাজ্যে তাঁ'রই খরচে ইংরাজ কোম্পানীর একদল সৈন্য প্রতি-পালিত হইত। ছোটলাট কল্‌বিন-সাহেব মনে করিয়া-ছিলেন যে, ভারতব্যাপী এই বিদ্রোহের সুযোগে তরুণ জয়াজী রাও হয়তো সিপাহীদের পক্ষাবলম্বন করিয়া নিজে স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু জয়াজী রাও ইউরোপীয়দিগকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করেন। ইংরাজ-দের অধীনে যে সিপাহীরা ছিল তা'রাই বিদ্রোহী হয় এবং একদিন ইংরাজগণ তা'দিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছেন এই জনরব শুনিয়া হঠাৎ ইংরাজদিগকে আক্রমণ করে। ইহাতে কুড়িজন ইংরাজ নিহত হ'ন। উত্তেজিত সিপাহিগণ স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে

হত্যা করে নাই, তা'দের প্রতি সদয় ব্যবহারই করিয়াছিল ; তা' ছাড়া বহু সিপাহী নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়াও তা'দিগকে এবং অন্যান্য ইউরোপীয়দিগকে আগ্রায় পলায়ন করিবার সুযোগ করিয়া দেয়।

নসিরাবাদের সিপাহীরাও প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করিল। ইউরোপীয়গণ সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি ফেলিয়া ৩০ মাইল দূরে বেওয়ারে পলায়ন করেন, কাজেই উত্তেজিত সিপাহীরা বিনা বাধায় তাঁ'দের গৃহে আগুন ধরাইয়া, সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া, কারাগারের কয়েদীদিগকে মুক্তি দিয়া দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করে।

নিমচে সরকারের একটি প্রধান সেনানিবাস ছিল। এখানেও সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া, লুণ্ঠন, গৃহ-দাহ ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট কার্য্যগুলি নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করে এবং তা'র পর মহোল্লাসে দিল্লীর দিকে ছুটে।

তুকাজী রাও হোলকারের ইন্দোর রাজ্যেও সিপাহীরা ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠে। কিন্তু কেহই মনে করে নাই যে, তা'রা ইউরোপীয়দিগকে হঠাৎ আক্রমণ করিবে। কার্য্যতঃ তা'রা তা'ই করে। বৃটিশ রেসিডেন্ট্ কর্ণেল ডুরাণ্ড পলায়ন করিতে বাধ্য হ'ন। মহিলা ও বালক-বালিকাদিগকে কামান বহন

করিবার গাড়ীতে তুলিয়া ইউরোপীয় পুরুষগণ, কেহ বা হাতীতে, কেহ বা ঘোড়ায় চড়িয়া চলিলেন। ২০০ অশ্বারোহী, কতক পদাতিক এবং ৩০০ ভীল সৈন্য তাঁ'দিগকে রক্ষা করিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। পলাতকগণ ভূপালের দুর্গে আশ্রয় লইলেন। তাঁ'দের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইল, আবাস-গৃহ সকল ভস্মীভূত হইয়া গেল।

এ-দিকে ইন্দোর রাজ্যের মৌ সেনানিবাসের সিপাহীরা হঠাৎ একদিন উত্তেজিত হইয়া তা'দের অধ্যক্ষ কর্ণেল প্লাট ও অপর কয়েকজন 'অফিসর'কে গুলি করিয়া নিহত করিল। ইউরোপীয়দের বাসস্থান পুড়িয়া গেল। গোলন্দাজদের অধ্যক্ষ হাঙ্গারফোর্ড সন্দিহান হইয়া পূর্ব্ব হইতেই কামান সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন কামান হইতে অগ্নিবর্ষণ হইতেই সিপাহীরা দলে দলে ইন্দোরের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। হাঙ্গারফোর্ড দুর্গরক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। কর্ণেল ডুরাণ্ড, এমন কি লর্ড ক্যানিং পর্য্যন্ত মহারাজকে দোষী মনে করেন; কিন্তু অধিকাংশের মতে তিনি নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হ'ন। পরিশেষে সরকারও তাঁ'কে সমাদর করেন।

১৩

আগ্রায়

আগ্রার কর্ত্তৃপক্ষ সন্দেহের বশীভূত হইয়া সিপাহী-দিগকে নিরস্ত্র করিলেন। সিপাহীরা চলিয়া গেল। জুন মাসের শেষভাগে নিমচ ও নসিরাবাদের বিদ্রোহী সিপাহীরা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া আগ্রার দিকে আসিতেছে বলিয়া সংবাদ আসিল। কাজেই কর্ত্তৃপক্ষ সকল নিরস্ত্র খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীকে নিতান্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লইয়া দুর্গে আশ্রয় লইতে আদেশ দিলেন। বিদ্রোহী সিপাহীদিগকে আগ্রা আসিবার পথে বাধা দিবার জন্য যে সিপাহীদলকে পাঠানো হইয়াছিল তা'রা কয়েকজন ইংরাজ 'অফিসার'কে নিহত করিয়া বিদ্রোহী-দের সঙ্গে যোগ দিল। আগ্রার ইউরোপীয় মহলে ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি হইল, তাঁ'রা সকলেই মহিলা ও বালক-বালিকাদিগকে লইয়া দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এমন কি ছোটলাট-সাহেবকেও দুর্গের মধ্যে গিয়া থাকিতে হইল।

নিমচের বিদ্রোহী সিপাহীদিগকে বাধা দিবার জন্য

ব্রিগেডিয়ার পল্‌হোয়েল ৮০০ জন সুশিক্ষিত ইংরাজ সৈন্য লইয়া আগ্রা হইতে বাহির হইলেন। বিপক্ষ-দলের সৈন্য সংখ্যা দুই হাজারেরও উপরে ছিল। ইংরাজ সৈন্য শাহগঞ্জ নামক স্থানে উপস্থিত হইলেই বিপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ হইল। এখানে প্রায় তিন ঘণ্টা কাল যুদ্ধ চলিল। ইংরাজ-পক্ষের বহু অশ্ব এবং যোদ্ধা নিহত হইল। ক্রমে ইংরাজ-পক্ষের বল এতই হ্রাসপ্রাপ্ত হইল যে, কামান, এমন কি নিহত অধিনায়কদিগকে পর্য্যন্ত ফেলিয়া রাখিয়া, ইংরাজ সৈনিকগণকে দ্রুত পলায়ন করিতে হয়। আগ্রায় ইউরোপীয়দের সমস্ত গৃহই ভস্মীভূত এবং সমস্ত সম্পত্তি বিলুণ্ঠিত হইল, সরকারী কাগজপত্রও সব পুড়িয়া গেল। উত্তেজিত সিপাহীরা দুর্গ আক্রমণ না করিয়া দিল্লীর দিকে প্রস্থান করিল। ইহাতে ইউরোপীয়-দের আতঙ্ক অনেকটা কমিল বটে, কিন্তু তখনও তাঁ'রা দুর্গের বাহিরে আসিতে সাহস করেন নাই। নানা বর্ণের খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ও বিশ্বস্ত ভারতীয় সাহায্য-কারী মোট প্রায় ছয় হাজার লোক দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিল। এই সময়ে দলবদ্ধ ভারতবাসীদের দেখিলেই ইউরোপীয়দের চক্ষের সাম্‌নে বিভিন্ন বিভীষিকার সৃষ্টি হইত বটে, কিন্তু এই ভারতবর্ষীয় লোকের চেষ্টায়, দয়ায়

ও সদ্ব্যবহারেই আবার অনেক স্থলে তাঁ'দের আত্মরক্ষার অভাবনীয় সুবিধাও ঘটিয়াছিল।

মোগলের চিরবিখ্যাত মতি মস্‌জিদ এই সময়ে ইউরোপীয়দের হাসপাতালে পরিণত হয়। যাঁ'রা আহত ও পীড়িত হইয়াছিলেন এই মতি মস্‌জিদই তাঁ'দের চিকিৎসা ও আরামের স্থান হইয়াছিল।

যুদ্ধে পরাজয় হওয়ায় বড়লাট ব্রিগেডিয়ার পল্‌হোয়েলকে পদচ্যুত করেন। এ-দিকে সমস্ত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ বিদ্রোহানলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। আগ্রার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে বহু ক্ষমতাশালী লোক প্রধান হইয়া দিল্লীর বাদশাহের নামে শাসনকার্য্য চালাইতে আরম্ভ করিলেন। আগ্রার কর্ত্তৃপক্ষ অবরুদ্ধপ্রায় অবস্থায় দুর্গে থাকিয়াও এই সব বিশৃঙ্খলা নিবারণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

১১

অযোধ্যা—লক্ষ্ণৌয়ে

বাংলার সিপাহীদের আবাসস্থল অযোধ্যার বিপ্লবই ইউরোপীয়দিগকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সন্ত্রস্ত ও চিন্তাকুল করে। কোম্পানীর অযোধ্যা অধিকার করিবার পর প্রজার করভার বৃদ্ধি হয়, বহু তালুকদার সম্পত্তিচ্যুত হ'ন, বহু সম্ভ্রান্ত বংশের লোক নিঃস্ব হইয়া পড়েন, এমন কি তাঁ'দের অনেককে ভিক্ষাবৃত্তিও অবলম্বন করিতে হয়।

অযোধ্যার প্রধান নগর লক্ষ্ণৌ গোমতীর তীরে অবস্থিত। এ-স্থানের অধিবাসিগণ, বিশেষতঃ মুসলমানগণ কোম্পানীর শাসনে অত্যন্ত বিরক্ত ও উত্তেজিত হইয়া উঠেন। কোম্পানীর শাসন সম্বন্ধে একজন ফকির বিরুদ্ধ বক্তৃতা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁ'কে ১০০ ঘা বেত মারা হয়। এমনি করিয়া অসন্তোষ বৃদ্ধিই পায়। সরকারের নিয়োজিত অনেক দেশীয় কর্ম্মচারীর যথেচ্ছাচারও তা'তে ইন্ধন জোগায়।

মে মাসের প্রথম ভাগেই অযোধ্যার একদল পদাতিক নূতন টোটা ব্যবহার করিতে অস্বীকার করিল। তখন স্যর হেনরী লরেন্স জোর করিয়াই তা'দিগকে নিরস্ত্র

করিতে সঙ্কল্প করেন। তা'দিগকে কাওয়াজের ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান করানো হইল, কিন্তু যখন তা'রা দেখিল যে, তা'দের সাম্‌নে কামান সকল সজ্জিত এবং তা'তে আগুন ধরাইবার জন্য গোলন্দাজগণ উদ্যত হইয়া রহিয়াছে, তখন তা'রা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। কেবল ১২০ জন সেখানে থাকিয়া বিনা আপত্তিতে অস্ত্র ত্যাগ করে।

লক্ষ্ণৌয়ে তখন বহু সহস্র সিপাহী ও অস্ত্রধারী লোকের বাস। ইউরোপীয় সেনানিবাস নগর হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে অবস্থিত। গোমতী তীরে একটি পাহাড়ের উপর রেসিডেণ্ট-সাহেবের প্রাসাদ-তুল্য বাস-ভবন বিরাজ করিত। এই রেসিডেন্সীর সীমানার মধ্যেই সরকারী ধনাগারে বহু লক্ষ টাকা ছিল। দেশীয় সিপাহীরাই এখানে প্রহরীর কাজ করিত; এখন তা'দের পরিবর্ত্তে বহুসংখ্যক ইউরোপীয় প্রহরীর উপর সমগ্র রেসিডেন্সী রক্ষার ভার অর্পিত হইল। তা'র পর এখানেই ইউরোপীয় বালক-বালিকা, মহিলা ও অক্ষম ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় দিবার ব্যবস্থা করা হইল।

চারিদিকের সংবাদে লক্ষ্ণৌয়ের অনেক সিপাহী অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছিল। শেষে ৩০শে মে, রাত্রি

৯টার সময়, সিপাহীদের মধ্যে বিপ্লব আরম্ভ হইল। সকল সিপাহীই বিপ্লবে যোগ দেয় নাই—অনেক সিপাহী সরকারের পক্ষাবলম্বন করিয়া তা'দের বিশ্বস্ততার পরিচয় দেয়। কিন্তু দলে দলে বিদ্রোহী সিপাহী ইউরোপীয় 'অফিসার'দের বাংলোগুলি লুণ্ঠন এবং ভস্মীভূত করিতে লাগিল। ইউরোপীয়গণ পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁ'দিগকে বধ করিতে পারিল না। ব্রিগেডিয়ার ও অপর একজন ইউরোপীয় সেনানায়ক নিহত হ'ন। স্যর হেন্‌রী লরেন্সের চেষ্টায় কিছুকালের জন্য বিদ্রোহী সিপাহীদল ছত্রভঙ্গ হইল।

লক্ষ্ণৌয়ের বিপ্লবের সংবাদে অযোধ্যার অন্তর্গত সকল সেনানিবাসের সিপাহীরাই উত্তেজিত হইয়া উঠিল। খয়রাবাদ বিভাগের সীতাপুরে সিপাহীরা অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িল। অবস্থা খারাপ দেখিয়া ইউরোপীয় স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা সহ, কমিশনারের বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন। সশস্ত্র পুলিশ বাড়ী রক্ষার জন্য প্রহরীর কাজ করিতেছিল, কিন্তু এই পুলিশও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তখন কোন উপায় না দেখিয়া ইউরোপীয়গণ মহিলা ও বালক-বালিকাদিগকে লইয়া প্রাণভয়ে নদীর দিকে পলায়ন করেন। নদীর তীরেই কমিশনার, তাঁ'র

স্ত্রী ও শিশুসন্তান এবং আরও অনেক ইউরোপীয় সিপাহীদের গুলিতে প্রাণত্যাগ করেন। কেহ কেহ শুধু অদৃষ্টের বলে বাঁচিয়া যা'ন। এ-সময়েও বহু বিশ্বাসী সিপাহী সেই পলাতকদিগকে রক্ষা করে।

খয়রাবাদ বিভাগের মোহমদীতে বিপ্লব ঘটিল। ৪ঠা জুন সিপাহীরা ধনাগার লুণ্ঠন ও কয়েদীদিগকে মুক্ত করিয়া একটা মহা উলট-পালট বাধাইয়া দিল। কাপ্তেন অর্ ও অন্যান্য ইউরোপীয়েরা মহিলা ও বালক-বালিকা-দিগকে গাড়ীতে তুলিয়া আওরঙ্গাবাদে পলায়ন করিলেন। কিন্তু সিপাহীদের গুলিতে পথেই তা'দের প্রায় সকলেই নিহত হইলেন, কেবল কাপ্তেন অর্ এক জন সিপাহীর চেষ্টায় কোন রকমে বাঁচিয়া গেলেন।

অযোধ্যার ফৈজাবাদ বিভাগেও অন্যান্য স্থানের মত বিপ্লব দেখা দিল। বহু পূর্ব্ব হইতেই ইউরোপীয়গণ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছিলেন। অবশেষে ৮ই জুন সন্ধ্যার সময় সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া লুণ্ঠন, অগ্নিদাহ ইত্যাদি কার্য্য যথারীতি সম্পন্ন করিল বটে, কিন্তু 'অফিসার'দের কোন অনিষ্ট করিল না। কমিশনার-সাহেব, তাঁ'র সঙ্গের পলাতক ইংরাজগণ এবং 'অফিসার'দিগকে চারিখানি নৌকায় পলায়ন করিবার সকল সুযোগ ও সুবিধা সিপাহীরাই

করিয়া দিল। সিপাহীরা দয়াপরবশ না হইলে কোন ইংরাজই সেখান হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন না। যা' হোক্, সেখানে নিষ্কৃতি পাইলেও প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে গিয়া তাঁ'রা বিপদে পড়িলেন। বিদ্রোহী পদাতিক ও অশ্বারোহী সিপাহীদিগকে তাঁ'রা যমদূতের ন্যায় দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়-মান দেখিলেন। নদী পার হইয়া পলাইবার সময় কেহ কেহ জলমগ্ন হইলেন, কেহ কেহ বা সিপাহীদের গুলিতে প্রাণ দিলেন। কেবল আট জন মাত্র কোনরূপে বাঁচিয়া রহিলেন ; কিন্তু একটি মুসলমান পল্লীর মধ্য দিয়া যাইবার সময় পল্লীবাসিগণের হাতে সাত জন নিহত হইলেন। মাত্র এক জন অতি কষ্টে পলাইয়া জীবন রক্ষা করিলেন। যা'রা নৌকায় না পলাইয়া শাহগঞ্জে গিয়া রাজা মানসিংহের আশ্রয় লইয়াছিলেন তাঁ'রা বাঁচিয়া গেলেন। কুল-কামিনী ও শিশুদিগকে পল্লীর নারীরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়াও লুকাইয়া রাখেন। অনেক রমণী বহু ইংরাজ শিশুকে নিজেদের স্তন্যদুগ্ধ দিয়া রক্ষা করেন।

সুলতানপুরেও বিদ্রোহের আভাস পাওয়া মাত্রই কর্ণেল ফিশার মহিলা ও শিশুদিগকে এলাহাবাদে পাঠাইলেন। ঠিক তা'র পরদিনই বিপ্লব করাল মূর্ত্তিতে

দেখা দিল। ইউরোপীয়দের বাসগৃহ ভস্মীভূত, সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইল। ইউরোপীয়েরা পলায়ন করিলেন, কিন্তু স্বয়ং কর্ণেল ফিশার ও অপর কয়েক জন ইউরোপীয় বিদ্রোহীদের গুলিতে প্রাণ দিলেন।

বহরেইচ্ বিভাগের কমিশনার বিদ্রোহের আশঙ্কায় সে-স্থান হইতে মহিলা ও বালক-বালিকাদিগকে লক্ষ্ণৌতে পাঠাইয়া দিলেন। যে তালুকদারদের সমস্ত সম্পত্তি সরকার কাড়িয়া লইয়াছিলেন, এই বিপদের সময় তাঁ'রাই ইংরাজদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। পরে কমিশনার প্রভৃতিকেও বহরেইচ্ ত্যাগ করিতে হয়। কমিশনার নিজে গণ্ডায় যা'ন। গণ্ডা ও সিক্রেরা হইতেও কমিশনার সাহেব ও অন্যান্য ইউরোপীয়গণকে জীবনরক্ষার্থে পলায়ন করিতে হয়। কিন্তু এ-দেশীয় পোষাক পরিয়া ছদ্ম-বেশে থাকা সত্ত্বেও পথে অনেকেই নিহত হ'ন। কমিশনার প্রভৃতি যাঁ'রা বাঁচিলেন তাঁ'দের কেহ বা গোরক্ষপুরে, কেহ বা লক্ষ্ণৌয়ের দিকে অতি কষ্টে পলায়ন করিলেন।

লক্ষ্ণৌ বিভাগের দরিয়াবাদে বিদ্রোহের আশঙ্কায় সেনা-নায়ক ধনাগার হইতে টাকা-কড়ি সেনানিবাসে আনিলেন। তিনি আরও একটি কাজ করিলেন—কয়েদিগণকেও মুক্ত

করিয়া সেনানিবাসে আনিয়া রাখিলেন। কিন্তু হঠাৎ সিপাহীরা একেবারেই অবাধ্য হইয়া উঠিল, সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া ইউরোপীয়গণ নানা উপায়ে লক্ষ্ণৌয়ের দিকে পলায়ন করিলেন।

এইরূপে অযোধ্যার প্রায় সকল স্থানেই ইংরাজের প্রাধান্য লোপ পাইল। পলায়নের পথে বহু ইউরোপীয় অতি নির্ম্মম ভাবে নিহত হইলেন। কিন্তু নির্ম্মমতার পার্শ্বেই মমতার মূর্ত্তিরও অভাব ছিল না। দানবপ্রকৃতির পার্শ্বেই আবার দেবপ্রকৃতিও ছিল। অনেকের রক্ষা করিবার চেষ্টা সত্ত্বেও, লক্ষ্ণৌ বিভাগে এক মৌলবীর প্ররোচনায় ১৯ জন অবরুদ্ধ শৃঙ্খলিত ইউরোপীয়কে হত্যা করা হয়।

২৯শে জুন সংবাদ আসিল যে, বিদ্রোহী সিপাহীদের একটা দল লক্ষ্ণৌ হইতে আট মাইল দূরে চিনহাট নামক স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে। স্যর হেন্‌রি লরেন্স ৩০শে জুন একদল ইংরাজ সৈন্য লইয়া চিনহাট যাত্রা করিলেন। এই চিনহাটেই ইংরাজের সহিত সিপাহীদের যুদ্ধ হইল। ইংরাজ সৈন্য দেখিবামাত্রই সিপাহীরা কামান হইতে অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। দুই দিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়া ইংরাজ সৈন্যের অনেকেই নিহত হইল। ইংরাজ-পক্ষের

শিখ সৈন্যদলও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। অল্পমাত্র যোদ্ধা লইয়া স্যর হেন্‌রি লরেন্স পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইলেন। ইংরাজের কামান সিপাহীদের হস্তগত হইল। শত উদ্যম সত্ত্বেও ইংরাজ সৈন্যের বিষম পরাজয় ঘটিল।

ইহার পর অযোধ্যার উত্তেজিত সিপাহীরা লক্ষ্ণৌয়ে ইংরাজদের আশ্রয়-দুর্গ আক্রমণ করিল। বিখ্যাত মচ্ছি-ভবনে ইংরাজদের ত্রিশটি কামান ও গোলা-গুলি ছিল, তাঁ'রা মচ্ছিভবন উড়াইয়া দিয়া যুদ্ধের উপকরণ ধ্বংস করিবার সঙ্কল্প করিলেন। বারুদের স্তূপে আগুন দিয়া মচ্ছিভবনের ইংরাজেরা বৃটিশ রেসিডেন্সীতে পলায়ন করিলেন। প্রচণ্ড শব্দে মচ্ছিভবনের কিয়দংশ একেবারে ধ্বংস হইয়া গেল।

সিপাহীরা রেসিডেন্সী লক্ষ্য করিয়া গুলি চালাইতে লাগিল। স্বয়ং স্যর হেন্‌রি লরেন্স একটি কামানের গোলার আঘাতে দেহত্যাগ করিলেন। রেসিডেন্সীতে ইংরাজ ও তাঁ'দের সাহায্যকারিগণ অবরুদ্ধভাবে রহিলেন। বালক-বালিকা সহ মহিলাগণও এইখানেই আশ্রয় লইয়াছিলেন, সুতরাং সেখানে আর তিল ধারণেরও স্থান ছিল না। অথচ সেখানে অনেকে হতাহতও হইতে লাগিলেন। রেসিডেন্সী রক্ষার জন্য ১৬৯২ জন

সৈনিক ছিল ; ইহার মধ্যে ৭৬৫জন ভারতবর্ষীয়। অবরোধ সময়ে ৪৮৩ জন হত ও আহত হয়। এ-সময় ইংরাজদের চরম দুর্দ্দশা হইয়াছিল। প্রায় তিন মাস এইরূপে সিপাহীদের দ্বারা অবরোধ চলিতে থাকে।

এ-দিকে নানা সাহেবকে পরাজয়ের পর কানপুর অধিকার করিয়া এবং সেনাপতি নীলকে সেখানে রাখিয়া, সেনাপতি হ্যাব্‌লক্ লক্ষ্ণৌ উদ্ধারের জন্য অভিযান করিলেন। পথে দুই স্থানে বিদ্রোহী সিপাহীদের সহিত তাঁ'কে যুদ্ধ করিতে হয়। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও তাঁ'র সৈন্যসংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হইল এবং তাঁ'দের মধ্যে রোগও দেখা দিল, কাজেই তিনি কানপুরের দিকেই ফিরিলেন। ভালরূপ প্রস্তুত হইয়া পুনরায় লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিলেন, কিন্তু পথে আবার সেই স্থানেই (বসিরথগঞ্জ) যুদ্ধ হইল। সিপাহীরা হারিল বটে, কিন্তু ইংরাজ-পক্ষকেও খুব দুর্ব্বল করিল। সেনাপতি আবার কানপুরে ফিরিলেন, আবার প্রস্তুত হইয়া লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিলেন। এবারও পথে বসিরথগঞ্জে যুদ্ধ হইল। জয়লাভ করিলেও সেনাপতিকে পুনরায় কানপুরেই ফিরিয়া আসিতে হইল। এবার সেনাপতি হ্যাব্‌লক্ বিঠুরে অভিযান করিলেন।

বিঠুরে অসীম তেজ ও অমিত পরাক্রম দেখাইয়া সিপাহীরা অতি কৌশলের সহিত ইংরাজ সৈন্যের ব্যূহ ভেদ করে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ইংরাজ সৈন্যই বিজয়ী হয়।

ইহার পর হ্যাব্‌লক্, আউট্‌রাম ও নীল—এই তিন জন লক্ষ্ণৌয়ের অবরুদ্ধ ইংরাজদের উদ্ধারের জন্য অভিযান করিলেন। লক্ষ্ণৌ প্রবেশের পথে সিপাহিগণ তাঁ'দিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। শেষে সঙ্গীনসহ আক্রমণে বিপক্ষের কামানগুলি অধিকার করিয়া তাঁ'দের সৈন্য লক্ষ্ণৌয়ে প্রবেশ করিল। সহরের পথে নানাস্থানে সিপাহিগণের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া সেনাপতিগণ সসৈন্যে রেসিডেন্সীতে উপনীত হইলেন। সেনাপতি আউট্‌রামের বাহুতে গুলি বিদ্ধ হয়, সেনাপতি নীল নিহত হ'ন। অসুস্থ ও আহত ব্যক্তিগণকে লইয়া পশ্চাৎবর্ত্তী সৈন্যদলসহ কর্ণেল নেপিয়ারও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এতদিনে অবরুদ্ধ ইউরোপীয়গণ উদ্ধারের নূতন আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু হ্যাব্‌লক্ ও আউট্‌রাম বিদ্রোহীদের লক্ষ্ণৌ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করিতে পারিলেন না। তা'রা লক্ষ্ণৌয়ের নানা স্থানে আধিপত্য করিতে লাগিল। সসৈন্যে হ্যাব্‌লক্ ও আউট্‌রামের আগমনে রেসিডেন্সীতে অবরুদ্ধ ইউরোপীয়দিগের শক্তিবৃদ্ধি হইল মাত্র।

১৫

বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ-দমন

দিল্লী শ্মশানে পরিণত হওয়ার পর কর্ণেল গ্রিথেড্ ইংরাজ ও বহু দেশীয় সৈন্য লইয়া ২৪ শে সেপ্টেম্বর দিল্লী হইতে বহির্গত হইলেন। তখন দিল্লী ও ইহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সকলে "চারিদিকে শব, আর্ত্তের রব, শ্বাপদে আনিছে ডাকি।" উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যার বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ-দমন ও শান্তি প্রতিষ্ঠাই হইল এই অভিযানের উদ্দেশ্য। কর্ণেল গ্রিথেড্ বুলন্দ-সহর আক্রমণ করিলেন। তাঁ'র দলের ৪৭ জন হতাহত হইল, বিপক্ষের ৩০০ জন নিহত হইল, কর্ণেল গ্রিথেড্ বিজয়-গৌরব-মণ্ডিত হইলেন।

কয়েকদিন পরেই সমস্ত পথে আতঙ্কের সঞ্চার করিয়া ইংরাজ সৈন্য আলিগড়ে উপস্থিত হয়। এখানকার বহু উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি বেগতিক দেখিয়া ধানের ক্ষেতে পলায়ন করে—সেখানেই তা'দের অনেকে নিহত হয়। এইরূপে আলিগড়ে সহজেই শান্তি স্থাপিত হয়। এই সময়ে গুপ্তচরের মারফতে গুপ্তচিঠি পাইয়া, গ্রিথেড্ তাড়াতাড়ি আগ্রার দিকে অভিযান করেন।

আগ্রায় পৌঁছিয়া শ্রান্তি দূর করিবার জন্য তাঁ'র সৈন্যগণ দুর্গের বাহিরে নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করিতেছিল, এমন সময়ে হঠাৎ তা'দের উপর গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। সকলেই উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িল, একটা প্রকাণ্ড হট্টগোল বাধিয়া গেল। তখন কর্ণেল গ্রিথেড্ তা'দিগকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। তা'রা আর পোষাক পরিবারও সময় পাইল না। গোলাবৃষ্টি করিতে করিতে ভীমবিক্রমে অগ্রসর হইল। বিদ্রোহী সিপাহীরা তেরটি কামান ফেলিয়া কালিনদী পার হইয়া পলায়ন করিল।

ইহার পর কর্ণেল হোপ গ্রাণ্ট্ কর্ণেল গ্রিথেডের কার্য্যভার লইয়া, মৈনপুরীতে বিদ্রোহ দমন করিয়া শান্তি স্থাপন করেন।

এ-দিকে প্রধান সেনাপতি স্যর কোলিন ক্যাম্বেল চারিদিকে বিপ্লব দমনের জন্য নানা স্থানের সৈনিক আনাইয়া, বিভিন্ন বিপ্লবকেন্দ্রে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। চীনদেশে যে সৈন্যদল যাইতেছিল তা'ও এই বিপ্লব-দমনে নিযুক্ত হয়। প্রধান সেনাপতি এই সময়ে কলিকাতায় ছিলেন। তিনি রাত্রিদিন ঘোড়ার ডাকে গিয়া এলাহাবাদে উপস্থিত হ'ন। তা'র পর

অতি সত্বরতার সহিত ফতেপুরে পৌঁছেন। অপর দিকে কাপ্তেন পীল কানপুরের পথে নানা জায়গায় সিপাহীদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া শান্তিস্থাপন করিলেন। লক্ষ্ণৌয়ের সংবাদ পাইয়া প্রধান সেনাপতি সর্ব্বপ্রথমে সেখানে যাওয়াই সঙ্গত মনে করিলেন। ইংরাজ সৈন্যের বিপ্লব-দমনে আগমনবার্ত্তা জানিয়া লোকালয়ের লোক গৃহত্যাগ এবং পল্লীবাসীরা পল্লীত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। পথঘাট, হাটবাজার সব নিঝুম, নিস্তব্ধ হইয়া বিপ্লবের ফল প্রদর্শন করিতে লাগিল।

নেপালের প্রধান মন্ত্রী জঙ্গ বাহাদুর তিন হাজার গুর্খা সৈন্য সহ আসিয়া এই সময়ে ইউরোপীয়দিগকে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

প্রধান সেনাপতি ও কর্ণেল হোপ গ্রাণ্ট্‌কে লক্ষ্ণৌয়ে পৌঁছিতে পথে বিশেষ বেগ পাইতে হইল। সিপাহীরা নানা স্থানেই তাঁ'দিগকে বাধা দিল। দুই-এক জায়গায় বিদ্রোহীরা ইংরাজ-পক্ষের সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত সৈন্যকেও পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য করিল এবং ইংরাজ-পক্ষের বলক্ষয়ে প্রধান সেনাপতিকেও চিন্তাকুল করিয়া তুলিল।

অনেক অজ্ঞাতনাম্নী ভারতরমণীও আত্ম-গোপন করিয়া এই বিপ্লবে যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। একটি ঘন-পল্লবযুক্ত বৃক্ষের উপর হইতে নিক্ষিপ্ত গুলিতে চারি-পাঁচ জন ইংরাজ সৈন্য নিহত হয়। পরে যখন ইংরাজ সৈন্যগণ উপরিস্থিত ব্যক্তিকে গুলি করিয়া নীচে ফেলিল, তখন দেখা গেল যে, সে একজন নারী।

এ-দিকে প্রধান সেনাপতি যা'তে লক্ষ্ণৌয়ে প্রবেশ করিতে পারেন সেজন্য সেনাপতি হ্যাব্‌লক্ প্রভৃতিও বিশেষরূপে চেষ্টা করিতেছিলেন ; কিন্তু সিপাহীদের অদ্ভুত রণকৌশলে সে-চেষ্টা তেমন ফলপ্রসূ হয় নাই। ইংরাজ সৈন্যের সুশৃঙ্খলা, অস্ত্রশস্ত্রের উৎকর্ষ, যুদ্ধোপকরণ সর-বরাহের সুবন্দোবস্ত ছিল, তাই যথেষ্ট বলক্ষয় হওয়াতেও তা'রা জয়লাভ করিয়া নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতেছিল, কিন্তু তখনও লক্ষ্ণৌ প্রবেশ করিতে সাহস করে নাই। শুধু লক্ষ্ণৌ প্রবেশের চেষ্টায়ই ইংরাজ-পক্ষের ৪৫ জন 'অফিসার' এবং ৪৯৬ জন সৈনিকের জীবন বিনষ্ট হয়। এই বলক্ষয়ে প্রধান সেনাপতি বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং শেষে বাধ্য হইয়া মহিলা ও বালক-বালিকাদিগকে লইয়া লক্ষ্ণৌয়ের রেসিডেন্সী ত্যাগ

করিবার জন্য ইংরাজদিগকে আদেশ দিলেন। গভীর নিশীথের গাঢ় অন্ধকারের যবনিকান্তরালে রেসিডেন্সী হইতে বাহির হইয়া তাঁ'রা সকলে আলমবাগে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেনাপতি হ্যাব্‌লক্ অতিসারে প্রাণ-ত্যাগ করিলেন। প্রধান সেনাপতি ২৫টি কামান ও ৪০০০ সৈন্যের সহিত সেনাপতি আউট্‌রামকে আলমবাগে রাখিয়া, নিজে ৩০০০ সৈন্য এবং প্রায় ২০০০ মহিলা, বালক-বালিকা ও রুগ্ন ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া কানপুরের দিকে যাত্রা করিলেন।

১৬

তাঁতিয়া তোপি

প্রধান সেনাপতি স্যর কোলিন ক্যাম্বেল ২৭শে নবেম্বর কানপুরে পৌঁছিলেন। সেনানায়ক ওয়াইণ্ড্‌হাম সিপাহী-দিগকে দমন করিবার জন্য কানপুরে প্রস্তুত হইতেছিলেন, এবার তিনি পাণ্ডুনদীর দিকে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। এখানে যে বীর-পুরুষের সহিত তাঁ'কে যুদ্ধ করিতে হয় তিনিই অসাধারণ রণ-কুশল ইতিহাস-বিখ্যাত তাঁতিয়া তোপি।

এই তাঁতিয়া তোপি মারাঠি ব্রাহ্মণ। ইনি সিপাহী যুদ্ধের অন্যতম প্রসিদ্ধ নায়ক নানা সাহেবের সহকারী ছিলেন। ইনি গোয়ালিয়রের সুপ্রসিদ্ধ বিদ্রোহী সিপাহী-দলের অধিনায়কতা করেন। এই সৈনিকদল যখন কানপুরের সাত মাইল দূরে পাণ্ডুনদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল, ওয়াইণ্ড্‌হাম তখন সসৈন্যে সেখানে অভিযান করিলেন। ইংরাজদের এ আক্রমণের জন্য তাঁতিয়া তোপি প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন। এই সুচতুর মারাঠি সেনাপতি যে-পথে কানপুরের দিকে অগ্রসর হ'ন, সে-পথের বিশেষ বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া সেই সকল

স্থানে কামান সহ সৈন্য সংস্থাপন করেন। এই সকল পথ দিয়াই ইংরাজদের রসদ যাইত, তিনি এই রসদ সরবরাহের পথ বন্ধ করিলেন। ২৬শে নবেম্বর, ইংরাজ-গণ পাণ্ডুনদীর তীরে সিপাহীদের সম্মুখীন হইলেন। এই প্রথম যুদ্ধে সিপাহিগণ পরাজিত হইল, কিন্তু তাঁতিয়া তোপি ইহাতে কিছুমাত্র দমিলেন না। তিনি অর্দ্ধচন্দ্রাকারে এরূপ একটি ব্যূহ রচনা করিলেন যে, পাঁচ ঘণ্টা ব্যাপী তুমুল যুদ্ধ করিয়াও ইংরাজ সেনাপতি সে ব্যূহ ভেদ করিতে পারিলেন না, এমন কি তাঁ'র সৈনিকদিগকেও সেখানে স্থির রাখিতে পারিলেন না ; তা'রা প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইল। এই প্রত্যাবর্ত্তন কালে ইংরাজ সৈন্য সন্ত্রস্ত ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল ; অনেকেই প্রাণ দিল এবং তা'দের বহু যুদ্ধোপকরণ সিপাহীরা হস্তগত করিল। ইংরাজসৈন্যের বিষম পরাজয় হইল। তা'র পরদিন তাঁতিয়া তোপি কানপুর অধিকার করিলেন। ইংরাজ সৈন্য নিজেদের সদ্য-নির্ম্মিত মৃন্ময় প্রাচীরের অন্তরালে আশ্রয় লইল। ব্রিগেডিয়ার উইলসন নিহত হইলেন।

তখনও রাত্রি হয় নাই। রাত্রি হইলে যে কি দশা ঘটিবে—এই চিন্তায় ইংরাজ সেনাপতি কাতর হইলেন,

কিন্তু সেই রাত্রেই প্রধান সেনাপতি ইংরাজদের মৃৎপ্রাচীর বেষ্টিত দুর্গে উপস্থিত হইলেন।

৬ই ডিসেম্বর প্রাতে উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এক পক্ষে নানা সাহেব ও তাঁতিয়া তোপি সৈন্য পরিচালনা করেন। অপর পক্ষে স্বয়ং প্রধান সেনাপতি স্যর কোলিন ক্যাম্বেল, ওয়াইণ্ড্হাম ও ওয়ালপোল প্রভৃতির তত্ত্বাবধানে যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধে তাঁতিয়া তোপির পরাজয় ঘটে। সিপাহিগণ সমস্ত দ্রব্যাদি ফেলিয়া বিঠুরের দিকে পলায়ন করে। ৯ই ডিসেম্বর পথে গঙ্গা পার হইবার সময় সিপাহীদের সহিত কর্ণেল হোপ গ্রাণ্টের এক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধেও তাঁতিয়া তোপির পরাজয় হইল। এ-দিকে নানা সাহেবও বিঠুর হইতে অনুচরগণ সহ অযোধ্যার দিকে পলায়ন করেন। কর্ণেল হোপ গ্রাণ্ট বিঠুরে প্রবেশ করিয়া নানা সাহেবের প্রাসাদ ভস্মীভূত করেন ও দেবমন্দির তোপে উড়াইয়া দেন।

১৭

ফতেগড়ে শান্তিস্থাপন

কানপুরে ইংরাজের প্রাধান্য স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু তখনও তাঁ'রা ফতেগড় পুনরধিকার করিতে পারেন নাই। কাজেই প্রধান সেনাপতি এখন প্রথমে ফতেগড়ে যাত্রা করাই স্থির করিলেন। এই অভিযানে তিনি পথিমধ্যে কালিনদীর তীরে বাধা পান ; সিপাহীদের তোপের মুখে তাঁ'র অনেক সৈন্য ক্ষয় হয়। পরে ইংরাজ-পক্ষের কামানের গোলায় বহু সিপাহী নিহত হইলে তা'রা পিছু হটিতে থাকে, তা'দের কামানও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। তিন-চারি মাইল যাইবার পর সিপাহীরা পুনরায় যুদ্ধের চেষ্টা করে, কিন্তু বিপক্ষের আক্রমণে নিতান্ত বিপর্য্যস্ত ও হীনবল হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। শেষে বিনা বাধায়ই ইংরাজ সৈন্য ফতেগড় দুর্গে প্রবেশ করে। সিপাহীরা প্রায় দশ লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি ফেলিয়া দুর্গ হইতে পলায়ন করিয়াছিল। এই সমস্ত দ্রব্য বিজেতা ইংরাজগণের হস্তগত হইল। ফতেগড় ইংরাজের সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইল।

ফরেক্কাবাদের নবাব ফতেগড়ের সিপাহীদের উৎসাহদাতা

ছিলেন। প্রকৃত নবাব মনে করিয়া তাঁ'র এক আত্মীয়কে ধরিয়া আনা হয়। সর্ব্বাঙ্গে শূকরের চর্ব্বি মাখাইয়া ও অন্যান্য প্রকারে লাঞ্ছিত করিয়া তাঁ'কে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করা হয়। তা'র পর একরূপ বিনা বিচারেই ম্যাজিষ্ট্রেট পাওয়ার-সাহেবের হুকুমে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়।* ফতেগড় বিভাগের অন্যান্য স্থানেও নির্ব্বিচারে সৈনিক-পুরুষদের যথেচ্ছাচারের স্রোত বহে। পালম্‌হাউ নামক স্থানে এক দিন অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় হইতে তা'র পরদিন প্রভাত কাল পর্য্যন্ত প্রকাণ্ড একটি বটগাছের শাখায় শাখায় কেবল ফাঁসির পর ফাঁসি চলে; শেষে গাছের শাখায় স্থানাভাব হয়।

---

* এইরূপ নানা কাজের জন্য পাওয়ার-সাহেবকে পরে 'সস্‌পেণ্ড' করা হয়। বহু ইংরাজ সৈনিক কর্ম্মচারী ও লেখক পাওয়ার-সাহেবের কার্য্যাবলীর সুতীব্র সমালোচনা করিয়াছেন।

লক্ষ্ণৌ ও বেরিলি উদ্ধার

প্রধান সেনাপতি ফতেগড়ে মাসখানেক থাকিয়া ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৮৫৮ খৃঃ) লক্ষ্ণৌয়ের দিকে যাত্রা করেন। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অধিনায়কগণের অধীনে বিভিন্ন সৈন্যদলের একত্র সমাবেশ করা হইল। স্যর কোলিন ক্যাম্বেল ৩১,০০০ সৈন্য ও ১৬০টি কামান লইয়া অভিযান করিলেন। সিপাহিগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ পথ না ধরিয়া অন্য পথে খুব কৌশলের সহিত ব্যূহ রচনা করিয়া, তিনি লক্ষ্ণৌয়ের পার্শ্ববর্ত্তী নানা স্থান অধিকার করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন।

ঘোড়দৌড়ের মাঠের নিকট একটি বাড়ীতে কয়েক জন সিপাহী ছিল। সেই বাড়ী অধিকার করিতে গিয়া মুষ্টিমেয় সিপাহীর তেজে একদল ইংরাজ সৈন্যকে হটিয়া আসিতে হয়। শেষে কামানের সাহায্যে ইংরাজ সৈন্য জয়লাভ করে। একজন মাত্র আহত সিপাহী জীবিত ছিল। উন্মত্তপ্রায় ইংরাজ ও শিখ সৈন্য তা'কে 'জরাসন্ধ-বধ' করিতে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হয়, পরে তা'কে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া নিজেদের প্রতিহিংসাবৃত্তি

চরিতার্থ করে ও সেই আগুন ঘিরিয়া উল্লাস প্রকাশ করিতে থাকে।

২১শে মার্চ্চের মধ্যে লক্ষ্ণৌয়ের এলাকা হইতে সমস্ত সিপাহীই পলায়ন করে। এইবার ইংরাজ, শিখ ও গুর্খা সৈন্যেরা ভীষণ লুণ্ঠন-ব্যাপারে রত হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, নেপালের প্রধান মন্ত্রী জঙ্গ বাহাদুর ৩,০০০ গুর্খা লইয়া ইংরাজ সরকারের সাহায্যের জন্য আসিয়াছিলেন। তিনিও এই সময়ে লক্ষ্ণৌয়ে ছিলেন। মোগলের প্রাসাদ হইতে সামান্য গৃহ পর্য্যন্ত লুণ্ঠিত হওয়ায় কত কোটি কোটি টাকার দ্রব্য বিনষ্ট ও চূর্ণীকৃত হইল। অনেক বাড়ীতে সিপাহীরা লুক্কায়িত ছিল, সেই সব বাড়ী বারুদ দিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয়, আর সিপাহীরা জীবন্ত দগ্ধ হইয়া প্রাণ হারায়।

লক্ষ্ণৌ অধিকৃত হইলেও সেখানকার সকল বিপত্তির অবসান হইল না। মৌলবী আহম্মদ উদ্দৌল্লা শাহজাহানপুরের ইংরাজ সৈন্যের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। অযোধ্যার বেগম হজরৎ মহল তাঁ'কে সাহয্য করিতে থাকেন। এই মৌলবী লক্ষ্ণৌয়ে বিদ্রোহের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই সিপাহীদিগকে উৎসাহিত

ও উত্তেজিত করিতেন। তিনি ১৫ই মে ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিলেন। দিন ভরিয়া যুদ্ধ চলিল। প্রধান সেনাপতি বহু সৈন্য লইয়া মৌলবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিলেন। মৌলবী মোহমদী প্রভৃতি স্থানের যাবতীয় দুর্গ ধ্বংস করিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। কিন্তু পোয়াইন নামক স্থানের রাজাকে স্বপক্ষে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতে গিয়া, রাজার ভ্রাতার গুলিতে নিহত হইলেন। মৌলবীর দল ছত্র-ভঙ্গ হইল। তাঁ'কে বধের পুরস্কার স্বরূপ রাজা সরকারের নিকট হইতে ৫০,০০০৲ টাকা পাইলেন। এই মৌলবীর জন্যই প্রধান সেনাপতির চেষ্টা ও উদ্যম দুইবার ব্যর্থ হইয়াছিল।

এবার প্রধান সেনাপতি রোহিলখণ্ড জয় করিতে মন দিলেন। তখনও খাঁ বাহাদুর খাঁ প্রবল প্রতাপে বেরিলি শাসন করিতেছেন। এ-দিকে ব্রিগেডিয়ার ওয়ালপোল রুইয়া প্রভতি স্থানে জয়লাভ করিয়া, ২৭শে এপ্রিল প্রধান সেনাপতির সহিত মিলিত হ'ন ও রোহিলখণ্ডে অভিযান করেন। মে মাসে এই সম্মিলিত বাহিনী বেরিলিতে উপস্থিত হয়।

বেরিলিতে অশ্বারোহী গাজিগণ অসামান্য বীরত্বের

সহিত যুদ্ধ করে। ওয়ালপোল আহত হ'ন, আর প্রধান সেনাপতি দৈবানুগ্রহে বাঁচিয়া যা'ন। পাঁচ জন গাজীর আক্রমণে সরকার-পক্ষের প্রায় ১০০ সৈনিক নিহত হয়। কিন্তু শেষে ইংরাজ-পক্ষেরই জয় হইল। খাঁ বাহাদুর খাঁ পলায়ন করিতে বাধ্য হ'ন। ৭ই মে বেরিলি পুনরায় ইংরাজের অধিকারে আসে। এইরূপে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যার সকল স্থানের বিপ্লবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

১৯

ঝাঁসি—লক্ষ্মী বাই

মোরোপন্ত তাম্বে নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ সপরিবারে কাশীতে বাজী রাওয়ের ভ্রাতা চিমাজি আপ্পার সহিত বাস করিতেছিলেন। সেই সময়ে ১৮৩৫ অব্দে তাঁ'র একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। এই কন্যাই ভারতের ইতিহাসে চিরবরেণ্যা, প্রাতঃস্মরণীয়া লক্ষ্মী বাই। তাঁ'র বাল্যকালের নাম ছিল মনু বাই। তিন-চারি বৎসর বয়সে মাতৃহীনা হইয়া পিতার অত্যধিক আদরে তিনি লালিত-পালিত হ'ন। বাজী রাওয়ের দত্তকপুত্র নানা সাহেবের সঙ্গে মনু তরোয়াল খেলিতেন, ঘোড়ায় চড়িতেন, নানাবিধ পুরুষোচিত ক্রীড়ায় মত্ত থাকিতেন। মনুর অসাধারণ রূপলাবণ্য দেখিয়া সকলে তাঁ'কে 'ময়না' বলিয়া ডাকিত। লেখাপড়াতেও তাঁ'র অত্যন্ত আগ্রহ ছিল।

বাজী রাওয়ের ইচ্ছায় ঝাঁসির মহারাজ গঙ্গাধর রাওয়ের সহিত মনুর বিবাহ হয়। শ্বশুরগৃহে তাঁ'র লক্ষ্মীশ্রী দেখিয়া সকলেই তাঁকে লক্ষ্মী বলিয়া

ডাকিত, ইহাতেই শ্বশুরগৃহে তাঁ'র নাম হইল লক্ষ্মী বাই।

লর্ড ডাল্‌হৌসির স্বত্বলোপবিধি অনুসারে অনেক রাজ্যই কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হয়। লক্ষ্মী বাইয়ের এক পুত্র-সন্তান জন্মে, কিন্তু তিন মাসের মধ্যেই মারা যায়। রাজ্য ইংরাজ কোম্পানীর হস্তগত হইবে, এই আশঙ্কায় ও পুত্রশোকে গঙ্গাধর রাও পীড়িত হইয়া পড়িলেন, আর ভাল হইলেন না। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি একটি দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠানে, অতি কঠোর ব্রতাচরণে এই তেজস্বিনী লক্ষ্মী বাই শোক, তাপ ও অশান্তি ভুলিয়া থাকিতেন। কোম্পানী রাণী লক্ষ্মী বাইয়ের সঙ্গে অন্যায় ব্যবহারের চরম নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁ'র বৃত্তিও কমাইয়া দেওয়া হয়। তিনি ঘৃণায় বৃত্তিগ্রহণে সম্মত হ'ন নাই। বাইশ বৎসর বয়সের এই মহীয়সী মহিলা নিজের অন্তরের কোম্পানী-বিদ্বেষ চাপিয়া রাখিয়া ইংরাজ রাজপুরুষদের সহিত যে ভাবে নিজের ন্যায়সঙ্গত অধিকার সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ কথা কহিতেন, তা'তে তাঁ'র অসামান্য বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় পাওয়া যাইত।

ঝাঁসি তখন কোম্পানীর রাজ্যে পরিণত হইয়াছে।

সেখানে এই সময়ে একদল পদাতিক, একদল অশ্বারোহী ও কয়েকজন গোলন্দাজ সৈন্য ছিল। কাপ্তেন ডন্‌লুপ ছিলেন ইহাদের অধিনায়ক, আর কাপ্তেন স্কীন ছিলেন কমিশনার।

সিপাহীদের মধ্যে কোন উত্তেজনার লক্ষণ না দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ অনেকটা নিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু ওরা জুন হঠাৎ সৈনিক-নিবাসের দুইখানি বাংলো পুড়িয়া গেল এবং ৫ই জুন দুর্গের দিকে বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। ইউরোপীয়গণ পরিবারবর্গের সহিত নগরের দুর্গে আশ্রয় লইলেন। 'অফিসার'গণ সেনানিবাসে রহিলেন। সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া ইউরোপীয় 'অফিসার'দের প্রায় সকলকেই নিহত করিল। তার পর কয়েদীদিগকে কারামুক্ত করিয়া তা'দিগকে লইয়াই সিপাহীরা দুর্গ অবরোধ করিল। কাপ্তেন গর্ডন নিহত হইলেন। দুর্গের গোলা-গুলি-বারুদ সব ফুরাইয়া গেল। তখন বাধ্য হইয়া কাপ্তেন স্কীন আত্মসমর্পণ করা স্থির করিলেন। দুর্গস্থিত সকলেই অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন, কিন্তু উত্তেজিত সিপাহীদের অস্ত্রাঘাতে দুর্গের এই পঞ্চাশ-ষাট জন ইউরোপীয়ের প্রাণ গেল।

লক্ষ্মী বাই ইহা জানিতেও পারেন নাই, তাঁ'র কর্ম্ম-

চারীদের মধ্যে কেহই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। কোম্পানীর অশ্বারোহী দলই এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী। রাণীর নিকট ডেপুটি কমিশনার সাহায্য প্রার্থনা করিলে, রাণী সাহায্য করিতে সম্মত হ'ন এবং ইংরাজ রমণী ও বালক-বালিকাদিগকে খুব যত্নের সহিত নিজ প্রাসাদে আশ্রয় দেন। কিন্তু ইউরোপীয়গণ দুর্গ অধিক নিরাপদ মনে করিয়া মহিলা ও শিশুদিগকে দুর্গে লইয়া যা'ন। ইহা সত্ত্বেও দয়াশীলা রাণী বিদ্রোহীদের অজ্ঞাতে ইউরোপীয়-দের জন্য তিন দিন খাদ্য দ্রব্যাদি পাঠাইয়া দেন।

তা'র পর সিপাহীরা রাজপ্রাসাদ অবরোধ করিয়া রাণীর নিকট তিন লক্ষ টাকা দাবী করিল। টাকা না দিলে তোপে প্রাসাদ উড়াইয়া দিবে বলিয়া ভয়ও দেখাইল। রাণীর তখন অর্থসম্বল বিশেষ কিছুই ছিল না, কিন্তু সিপাহীরা কোন যুক্তি না শুনিয়া রাণীর পিতাকে বন্দী করিল। তখন অগত্যা অলঙ্কারাদিতে এক লক্ষ টাকা সিপাহীদিগকে দিয়া রাণী কোন প্রকারে তা'দের হাত হইতে রক্ষা পাইলেন। সিপাহীরা টাকা লইয়া দিল্লীর দিকে ছুটিল। লক্ষ্মী বাই বিশিষ্ট রাজপুরুষদিগকে সকল কথা লিখিয়া জানাইলেন যে, যত দিন ইংরাজ ঝাঁসি পুনরধিকার করিতে না পারেন, তত দিন তিনি

ইংরাজের প্রতিনিধি হইয়া ঝাসি শাসন করিতে থাকিবেন। কিন্তু ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্ব হইতেই রাণীর উপর বিরূপ ছিলেন; কোন কথা না শুনিয়াই তাঁ'রা রাণীকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন। অতি অল্পবয়স্কা, অনাথা মহিলা ঘোর বিপদে পড়িলেন। তাঁ'কে এই মহাদুর্য্যোগে রক্ষা করিবে এমন কোন লোকই তিনি পাইলেন না। তা' ছাড়া, তাঁ'রই আত্মীয় সদাশিব রাও ঝাঁসির রাজা হইবার জন্য রাণীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন এবং নিজেকে ঝাঁসির মহারাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। রাণী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাঁ'র সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ও তাঁ'কে বন্দী করিতে বাধ্য হইলেন। বহু বিপদের এই একটি কাটিতে না কাটিতেই আর একটি বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঝাঁসি-সংলগ্ন বোর্‌ছা-রাজ্যের দেওয়ান নথে খাঁ ঝাঁসি আক্রমণ করিবার জন্য কুড়ি হাজার সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইলেন। কোম্পানী ঝাঁসি অধিকার করার পর রাণীর সৈন্য এবং গোলা-বারুদ ইত্যাদি কিছুই ছিল না, তবু তাঁ'র ব্যাকুল আহ্বানে বুন্দেলখণ্ডের সর্দ্দারগণ সসৈন্যে ঝাঁসিতে আসিয়া সমবেত হইলেন। বীরাঙ্গনা লক্ষ্মী বাই হিন্দু কুলবধূর বেশ পরিত্যাগ করিয়া পাঠানীর বেশ ধারণ

করিলেন এবং তরবারি হস্তে স্বয়ং দুর্গের উপরে রহিলেন। যুদ্ধে নথে খাঁ পরাজিত হইলেন। রাণী এই ব্যাপারের বিবরণ রাজপুরুষদিগকে পত্র লিখিয়া জানাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু নথে খাঁর গুপ্তচর এই পত্র ধরিয়া ফেলে এবং নথে খাঁ স্বয়ং রাজপুরুষদের নিকট রাণীকে দোষী করিয়া ঠিক বিপরীত ভাবে ঘটনাটি বিবৃত করেন। কাজেই রাজপুরুষগণ রাণীর মনোগত ভাব বুঝিতে পারিলেন না। ইহা ছাড়া, ঝাঁসির পার্শ্ববর্ত্তী দতিয়া প্রভৃতি রাজ্যের রাজারাও সুযোগ বুঝিয়া ঝাঁসি আক্রমণ করেন, কিন্তু পরাজিত হ'ন; কাজেই তাঁ'রাও রাণীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া ইংরাজ রাজপুরুষগণের অনুগ্রহ লাভ করেন। যে রাণী কোম্পানীর প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য এত করিলেন, তাঁ'র সম্বন্ধে রাজপুরুষগণের বিপরীত ধারণা হইল। ঝাঁসিতে কোম্পানীর ক্ষমতা লোপ পাইবার পর নয়-দশ মাস কাল তিনি অতি দক্ষতার সহিত রাজ্য-শাসন করেন।

রাণী লক্ষ্মী বাই কখনো নারীবেশে, কখনো বা পুরুষবেশে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন, সব সময়েই তাঁ'র কটিদেশে সুতীক্ষ্ণ তরবারি ঝুলিত। তিনি জননীর মত অপার স্নেহে আহতদের সেবাও করিতেন। যা'তে

ঝাঁসি রাজ্যে তাঁ'র পুত্রের অধিকার সরকার স্বীকার করেন, এই জন্যই তিনি তাঁ'র সুশাসিত রাজ্য কোম্পানীর হাতেই ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজ-পুরুষগণ তাঁ'কে একবার দোষী বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কোন প্রমাণ, বিচার বা যুক্তিতে তাঁ'রা মন দিলেন না। ১৮৫৮ অব্দের মার্চ্চ মাসে ইংরাজ সেনাপতি স্যর হিউ রোজ ঝাঁসির বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন।

এই সংবাদ পাইয়া রাণী তাঁ'র সদভিপ্রায় জানাই-বার জন্য রাজপুরুষগণের নিকট একজন দূত পাঠাইলেন। এই দূত বিশ্বাসঘাতকতা করিল। কাজেই রাণীর ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত হইল। এই ঘনীভূত বিপদের সময়ে তাঁ'র দরবারে বিশেষ অভিজ্ঞ লোক কেহই ছিলেন না। তা' ছাড়া, রাণী দুর্গেই থাকিতেন, বাহিরের খবর তাঁ'র কাছে খুব কমই আসিত। এ-দিকে তাঁ'রই কর্ম্মচারীরা ইংরাজদের বিরুদ্ধে সকলকে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিতে লাগিল। তিনি তখন বাধ্য হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ইংরাজ সৈন্যও নগরের খুব নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে, সময়ও অল্প। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই যুদ্ধের সুবন্দোবস্ত করিয়া

তিনি অসাধ্য সাধন করিলেন। ঝাঁসির মহিলাগণও তাঁ'কে সাহায্য করিতে লাগিলেন।

২১শে মার্চ্চ স্যর হিউ রোজ ঝাঁসিতে উপস্থিত হইলেন। ১৮ হইতে ৩০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ প্রাচীরের দ্বারা ঝাসির সাড়ে চার মাইল পরিধি পরিবেষ্টিত ছিল। ইংরাজ সৈন্যের প্রথম দুই দিনের আক্রমণ সম্পুর্ণ ব্যর্থ হইল। রাণীর অপূর্ব্ব রণ-কৌশলে ইংরাজ সেনাপতি বিস্মিত হইলেন। ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত দুই পক্ষে দিনরাত্র তুমুল যুদ্ধ চলিল। রাণী দুর্গের সর্ব্বত্র এবং নগরের যেখানে যাওয়া প্রয়োজন সেখানে যাইয়া সৈন্যসমাবেশ করিতে লাগিলেন। একে তিনি খুব অল্প সময়ের মধ্যে সৈন্য সংগঠন করিয়াছেন এবং তাঁ'র সুশিক্ষিত সৈন্যও খুব বেশী নয়, তা'র উপর ৩রা এপ্রিল রাণীর পক্ষেরই দলাজী সর্দ্দার নামে একজন বুন্দেলা সর্দ্দার দারুণ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া, নগরের প্রধান প্রবেশপথ বোর্‌ছা-দরওয়াজা অধিকার করিতে ইংরাজদিগকে সহায়তা করেন। ইংরাজ সৈন্য মইয়ের সাহায্যে প্রাচীরে উঠিয়া নগরে প্রবেশ করে। নগরে প্রবেশ করিয়া তা'রা যে যে পথ দিয়া গেল, সেই সেই পথের দুই পাশের সকল গৃহেই আগুন লাগাইয়া দিল,

এবং বালক-বৃদ্ধ-যুবা যা'কে পাইল তা'রই প্রাণান্ত করিয়া ছাড়িল। তা'র পর তা'রা নগরের মধ্যস্থ প্রাসাদ আক্রমণ করিল। প্রাসাদরক্ষী সৈন্যগণ বীরত্বের একশেষ দেখাইয়া প্রাণ দিল। রাণীর সৈনিকদের মধ্যে অনেকে পূর্ব্বেই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। নগরবাসীদেরও অনেকে হত হইয়াছিল এবং আগুনে নগরের চারিদিকে সবই ছারখার করিয়াছিল। এবার রাণী পুরুষ বেশে সজ্জিত হইলেন এবং পুত্র দামোদর রাওকে পিঠের সঙ্গে কাপড় দিয়া বাঁধিয়া লইয়া অশ্বারোহণ করিলেন। তাঁ'র পিতা ও বিশ্বস্ত অনুচরগণও তাঁ'র সঙ্গে যাওয়ার জন্য অশ্বে আরোহণ করিলেন। গভীর রাত্রির দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া দুর্গের উত্তর দ্বার দিয়া রাণী পলায়ন করিলেন। ইংরাজ সেনাপতি তাঁ'কে ধরিবার জন্য সৈন্য পাঠাইলেন, কিন্তু কেহই তাঁ'কে ধরিতে পারিল না। রাণীর পিতা দতিয়া রাজ্যে পৌঁছিলে দতিয়ার রাজমন্ত্রী তাঁ'কে বন্দী করিয়া ইংরাজ রাজপুরুষদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। রাজপুরুষগণ রাণীর পিতাকে ফাঁসি দিলেন।

এ-দিকে ইংরাজ সৈন্য ঝাঁসিতে অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করিল। পাঁচ পাঁচ হাজার নিরীহ সরল

অধিবাসীকে তা'রা বধ করিল। এমনি ব্যাপার আরম্ভ হইল যে, শুধু আত্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্য বহু মহিলা কূপে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিলেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে লুণ্ঠনও চলিল। বিশ্বাসঘাতকের সহায়তায় ও তেরো দিন অহোরাত্র যুদ্ধের পর ঝাঁসিরাজ্য আবার কোম্পানীর অধিকারে আসিল।

রাণী কাল্পী নামক স্থানে পৌঁছিয়া তাঁতিয়া তোপির সহিত মিলিত হ'ন। নানা সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র রাও সাহেব ও তাঁতিয়া তোপির সৈন্যেরা শেষে কাল্পীর ৪০ মাইল দূরে স্যর হিউ রোজের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হয়। রাণীও স্বয়ং যুদ্ধস্থলে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু এই যুদ্ধ পরিচালনায় তাঁ'র পরামর্শ গ্রহণ করা হয় নাই। এই পরাজিত সৈন্যদল যেরূপ শৃঙ্খলার সহিত পশ্চাদপসরণ করে তা'তে ইংরাজ সেনাপতিও অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করেন।

কাল্পীর ছয় মাইল দূরে ইংরাজ সৈন্যের সহিত আবার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে রাণী এমন বীরত্বের পরিচয় দিলেন যে, সুশিক্ষিত ইংরাজ সৈন্যকেও হটিয়া যাইতে হইল। কিন্তু এই সময়ে নূতন একদল ইংরাজ সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইলে, স্রোত অন্যদিকে ফিরিল। রাণীকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল।

রাণী স্থির করিলেন যে, গোয়ালিয়রের দুর্গ অধিকার করিয়া, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের দোহাই দিয়া সেখানকার সিপাহীদিগকে হস্তগত করিবেন। এইরূপে দুর্গের আশ্রয় হইতে ইংরাজ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করা সহজসাধ্য হইবে। তাঁতিয়া তোপি ও রাও সাহেব ইহাতে সম্মত হইলেন। তাঁ'রা সকলেই গোয়ালিয়রে উপস্থিত হইলেন। রাজা ও রাজমন্ত্রী বাহিরে তাঁ'দের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেন; কিন্তু গোপনে ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষকেও সংবাদ দিলেন, এবং রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই স্বয়ং মহারাজা বহু সৈন্য লইয়া তাঁ'দিগকে আক্রমণ করিলেন। রাও সাহেব এই বিশ্বাসঘাতকতা প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী লক্ষ্মী বাই ইহা বুঝিতে পারিবা মাত্র ২০০ যোদ্ধা লইয়া, রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিতে এমন তেজে মহারাজার গোলন্দাজদিগকে আক্রমণ করিলেন যে, তা'রা কামান ফেলিয়া পলায়ন করিল। বহু সৈন্য সত্ত্বেও গোয়ালিয়রের মহারাজা পরাজিত হইয়া আগ্রার দিকে সবেগে পলায়ন করিলেন। বীরাঙ্গনার এই বীরত্বে সকলে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন।

গোয়ালিয়রের দুর্গ ও ধনাগার রাণীর অধিকারে আসিল। নানা সাহেব মহারাষ্ট্রের পেশোয়া এবং রাও

সাহেব গোয়ালিয়রের শাসনকর্ত্তা বলিয়া ঘোষিত হইলেন। কিন্তু রাও সাহেবের কর্ত্তব্য অবহেলায় এবং রাণীর উপদেশ পালন না করা য় সবই পণ্ড হইয়া গেল। স্যর হিউ রোজ বিপুল বাহিনী লইয়া গোয়ালিয়র আক্রমণ করিলেন। ১৮ই জুন তারিখের স্মরণীয় যুদ্ধে রাণী সারাদিন পুরুষের বেশে সজ্জিত থাকিয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিলেন, কিন্তু জয়লাভ করিতে না পারিয়া সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁ'র নিজের অশ্ব অত্যন্ত ক্লান্ত হওয়ায় ইতিপূর্ব্বেই তিনি মহারাজা সিন্ধিয়ার অশ্বশালা হইতে একটি অশ্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এখন সেই ঘোড়াটিতে আরোহণ করিয়াই তিনি পলায়ন করিলেন। কিছু দূর যাইবার পর একটি ছোট খাল সম্মুখে পড়িল, ঘোড়াটি কিছুতেই সেই খাল পার হইতে চাহিল না। এইরূপে বিলম্ব হওয়ার সুযোগ পাইয়া কয়েকজন ইংরাজ অশ্বারোহী তাঁ'কে আক্রমণ করিল। অসির আঘাতে রাণীর মস্তকের একাংশ বিচ্ছিন্ন হইল, বুকে সঙ্গীনের আঘাত লাগিল, কিন্তু আঘাত পাইয়াও তিনি শত্রুকে বিনাশ করিলেন। তাঁ'র অনুগামী একজন সর্দ্দার তাঁ'কে নিকটবর্ত্তী এক সাধুর পর্ণকুটীরে লইয়া গেলেন। সেইখানে পবিত্র গঙ্গাজল পান করিয়া, পুত্রের দিকে মুখ রাখিয়া, তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেন।

ঝাঁসি শান্ত হইল এবং ঝাঁসির পার্শ্ববর্ত্তী যে সকল স্থানে বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, সেই সব স্থানও আস্তে আস্তে শান্ত হইয়া আসিল।

রাণী লক্ষ্মী বাইয়ের পুত্র দামোদর রাও কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত গভীর অরণ্যে দুই বৎসর অতিবাহিত করেন; কিন্তু শেষে ধরা পড়েন। সরকার তাঁ'র জন্য মাসিক ২০০৲ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করেন।

২০

তাঁতিয়া তোপির পরিণাম

তখন জুন মাস। তাঁতিয়া তোপি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া জয়পুরের দিকে প্রস্থান করিলেন। তাঁ'কে ধরিবার জন্য ইংরাজ সৈন্যও বাহির হইল। গুপ্তচরের সংবাদ অনুসারে সেনাপতি রবার্টস্ তাঁতিয়া তোপির পূর্ব্বেই সসৈন্যে জয়পুরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গোয়ালিয়র, ঝাঁসি, ভরতপুর ও নসিরাবাদ প্রভৃতি ছয় জায়গায় ছয় দল সৈন্য রাখিয়া ইংরাজ সেনাপতিগণ তাঁ'কে বন্দী করিবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্ব্বত—সর্ব্বত্র গুপ্তচর আর সৈন্য ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। একে একে নয় মাস কাটিয়া গেল, কিন্তু সুচতুর মারঠি বীরের কোন সন্ধানই মিলিল না।

এই আত্মগোপনের সময়েও একবার ভিলবারা নামক স্থানে তাঁতিয়া তোপি সসৈন্যে সেনাপতি রবার্টসের সম্মুখীন হ'ন এবং যুদ্ধ করিয়া সৈন্য ও কামানাদি সহ সম্পূর্ণ অক্ষত শরীরেই পলায়ন করেন। ইহার মাত্র সাত দিন পরে বনাস্ নদীর তীরে রবার্টসের সৈন্যের সহিত তাঁ'র আবার যুদ্ধ হয়। এবারেও তিনি অক্ষত

শরীরেই প্রস্থান করেন। ইহার পর তিনি চম্বলনদী পার হইয়া কোম্পানীর অত্যন্ত অনুরক্ত ঝালর-পত্তনের রাজপ্রাসাদ অবরোধ করিলেন, এবং রাজার সৈন্যদলকে নিজের দলভুক্ত করিলেন। যুদ্ধের খরচের জন্য তিনি রাজার নিকট হইতে পাঁচ লক্ষ টাকা আদায় করেন। রাজা অত্যন্ত ভীত হইয়া মৌতে পালাইয়া যা'ন। তাঁতিয়া তোপি এইখানে পাঁচ-ছয় দিন রহিলেন। তা'র পর তাঁ'র সহচর রাও সাহেব ও বাঁদার নবাবের পরামর্শে তিনি ইন্দোরের দিকে যাত্রা করিলেন। পথে রাজগড়ে ইংরাজ সৈন্যের সহিত যুদ্ধে তিনি পরাজিত হ'ন। তা'র পর তিনি নানা-স্থানে নানাদিকেই ইংরাজ সৈন্য দেখিতে পাইলেন, কাজেই তাঁ'কে নানাস্থানেই যুদ্ধ করিতে হইল, কিন্তু নিজের দল-বল অত্যন্ত ক্ষুদ্র হওয়ায় পরাজিত হইলেন। এক এক স্থানে তিনি ইংরাজ সৈন্যদ্বারা অবরুদ্ধ হইয়াছেন, পলায়নের পথ নাই, কিন্তু তিনি অপূর্ব্ব চতুরতার সহিত পথ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। শেষে তাঁ'র বন্ধু ও সহচরগণ একে একে তাঁ'দের সৈন্যসহ তাঁ'কে ছাড়িয়া যাইতে লাগিলেন। বাঁদার নবাব অদৃশ্য হইলেন, আর রাও সাহেবও ঘোর বিপদের সময় তাঁ'কে ছাড়িয়া

চলিয়া গেলেন। তাঁ'র অন্যতম সহচর মানসিংহ বিষ-কুম্ভ-পয়োমুখ হইয়া তাঁ'র সর্ব্বনাশ সাধন করিলেন। নিবিড় জঙ্গলে তাঁ'র দিন কাটিতেছিল। এই সময়ে পরম বিশ্বাসঘাতক মানসিংহ তাঁ'কে ধরাইয়া দিবার জন্য ইংরাজ সেনানায়ক মিডের কাছে গেলেন। নিজের সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবেন আশায় মানসিংহ নিজের আত্মীয়, বন্ধু অনেককেই ধরাইয়া দিবার জন্য মিডের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন; অথচ তাঁতিয়া তোপি এই বিশ্বাস-ঘাতকের উপরই নির্ভর করিলেন।

গভীর নিশীথে নিবিড় অরণ্যের এক গুপ্তস্থানে তাঁতিয়া তোপি নিদ্রিত ছিলেন। সেই সময়ে স্বার্থপর মানসিংহ ইংরাজ সৈন্য লইয়া গিয়া নিদ্রিতাবস্থায়ই তাঁ'কে বন্দী করেন। তাঁ'কে মিডের শিবিরে লইয়া যাওয়া হইল। তাঁ'র প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল বীরপুরুষ অটলভাবে অম্লানবদনে ফাঁসির রজ্জু গলায় পরিলেন। *

---

* তাঁতিয়া তোপি কোম্পানীর প্রজা ছিলেন না, কোম্পানীর সহিত তাঁ'র প্রভু-ভৃত্য বা অন্য কোন প্রকারের সম্বন্ধও ছিল না। তিনি নরহত্যা করেন নাই, বা সে দোষে দোষী সাব্যস্তও হ'ন নাই।

তথাপি নিজ প্রভুর আদেশে, প্রভুর স্বার্থরক্ষার্থে কোম্পানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার একমাত্র অপরাধেই তাঁ'র প্রাণদণ্ড হয়। এই কারণে সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ ঐতিহাসিক কর্ণেল ম্যালিসন ইহাকে লঘু পাপে গুরু দণ্ড বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অধিকন্তু তাঁতিয়া তোপিকে প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমিক ও বীর আখ্যায় ভূষিত করিয়া ম্যালিসন তাঁ'র ঐতিহাসিক নিরপেক্ষতারও পরিচয় দিয়াছেন।

২১

বিদ্রোহের যবনিকা

চারিদিকের বিদ্রোহ দমন করিয়া, বিশেষতঃ লক্ষ্ণৌ পুনরধিকার করিয়া, প্রধান সেনাপতি স্যর কোলিন ক্যাম্বেল 'লর্ড' উপাধি পাইলেন। তাঁ'র নাম হইল লর্ড ক্লাইড্।

১৮৫৭ অব্দের প্রারম্ভেই বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। ১৮৫৮ অব্দের শেষভাগে বিদ্রোহের কার্য্যতঃ অবসান ঘটিলেও ১৮৫৯ অব্দের প্রথম ভাগ পর্য্যন্তও কোন কোন স্থানে বিদ্রোহের ভাব জাগ্রত ছিল। ঐ বৎসর মে মাসে বিদ্রোহের যবনিকা পতন হয়। বহু ভূস্বামী ও ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি ইংরাজ রাজপুরুষগণের নিকট আত্মসমর্পণ করেন, অনেক বিদ্রোহী নেতা নিহত হ'ন, ফাঁসি কাষ্ঠে প্রাণ দেন, আবার কেহ-কেহ সাধারণের অজ্ঞাত বন-জঙ্গলে বা পর্ব্বত-মধ্যে লুক্কায়িত থাকেন, কেহ কেহ বা বৃটিশরাজ্য ছাড়িয়া নেপালের কোন কোন স্থানে চিরকাল গোপনে রহিলেন। বেরিলির খাঁ বাহাদুর খাঁ ধৃত হ'ন; তাঁ'র ফাঁসি হয়। মিথৌলির বৃদ্ধ রাজা আন্দামান দ্বীপে আজীবন নির্ব্বাসিত হ'ন। আজিম উল্লা ও নানা সাহেবের কোনরূপ

উদ্দেশ পাওয়া যায় না। বহু চেষ্টা করিয়াও কর্ত্তৃপক্ষ নানা সাহেবকে বন্দী করিতে পারেন নাই।

একদিন মোগল বাদশাহের কৃপার ভিখারী হইয়া কোম্পানীর বিশিষ্ট ইংরাজগণ তাঁ'র সম্মুখে করজোড়ে, নতশিরে দণ্ডায়মান থাকিতেন, আর এখন সেই মোগল বাদশাহেরই বংশধর বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে বন্দী করিয়া, তাঁ'রই প্রাসাদের দরবার-গৃহে বসিয়া, কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ তাঁ'কে নির্ব্বাসন দণ্ড দিলেন এবং সপরিবারে চিরদিনের জন্য সুদূর পেগুতে প্রেরণ করিলেন।

১৮৫৮ অব্দের অগাষ্ট মাসে ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া কোম্পানীর হাত হইতে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিয়া ভারতেশ্বরী হ'ন। ১লা নবেম্বর তাঁ'র বিখ্যাত ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইলে দেশীয় রাজন্যবর্গ আশ্বস্ত হইলেন এবং ভারতবাসীও আশান্বিত হইল।

বিদ্রোহী সিপাহীরা প্রাণপাত যুদ্ধ করিয়াও শেষে ব্যর্থকাম হইবার মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, তা'দের মধ্যে এমন কোন যোগ্য নেতা ছিলেন না যাঁ'র নির্দ্দেশ সংযত ও সংহত ভাবে সমস্ত সিপাহীই মানিয়া লইতে পারে। এই নেতৃত্ব লইয়াও সিপাহীদের মধ্যে আত্ম-কলহের সূত্রপাত হয়।

তা' ছাড়া বৃটিশ ভারতের এই বিদ্রোহ সিপাহী বিদ্রোহ বলিয়া অভিহিত হইলেও সকল সিপাহী ইহাতে যোগ দেয় নাই। অনেক সিপাহী বিশ্বস্ত ছিল এবং নিজেদের জীবন দিয়াও ইংরাজদিগকে সাহায্য করিয়াছিল। অধিকাংশ দেশীয় রাজা ও জমিদার বিদ্রোহীদের প্রতি কোন রকমের সহানুভূতি না দেখাইয়া সরকারকেই সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করেন। আর শিখ, গুর্খা ও হিন্দুস্থানী সৈনিকদল স্বদেশ ও স্বজাতির বিরুদ্ধে অমিত তেজে যুদ্ধ না করিলে দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর প্রভৃতি স্থান কোম্পানী যে কখনও পুনরধিকার করিতে পারিতেন না ইহা ইংরাজ সেনাপতিগণই স্বীকার করিয়াছেন। এক কথায়, কোম্পানী ভারতবাসিগণের সাহায্যেই বিদ্রোহী সিপাহীদিগকে পরাজিত করেন।